নির্গত। প্রথম প্রকারের ভিত্তিতে উহাকে ইশকে জাতি ও হাকিকি (সত্তাগত বা প্রকৃত প্রেম) বলা হয়। আর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের ভিত্তিতে ইহাকে ইশকে সিফাতী (গুণবাচক প্রেম) বা ইশকে আফয়ালী (কর্মবাচক প্রেম), বা ইশকে আছারি (নিদর্শনসূচক প্রেম) এবং ইশকে মাজাযি (রূপক প্রেম) বলা হয়। ইশকে জাতি ও হাকিকির নিদর্শন এই যে, প্রেমিকের অন্তর প্রকৃত উদ্দিষ্ট সত্তা ব্যতিত অন্য কিছুর উদ্দেশ্য থেকে খালি ও মুক্ত হবে। হযরত নেজামী গনজুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মছনবী শরীফের লায়লা-মজনু পর্বে বলেন-

মসনবী

বাসনাপূর্ণ প্রেম স্থায়ী হয় না- বাসনাপূর্ণ প্রেম করো কাছে বৈধ নয়।
বাসনাপূর্ণ প্রেম কোথায় যথার্থ ছিল? বাসনাপূর্ণ প্রেমকে ত্যাগ কর।

খোদা তালাশ ও জজ্‌বার (খোদার আকর্ষণ) পিপাসায় নিমগ্ন তার (প্রেমিক) অন্তর ভালবাসার মঞ্জিলে উড্ডয়নকারী। আর এই তালাশ ও জজ্‌বা এমন একটি বস্তু যে, উহার রীতি-পদ্ধতি বর্ণনায় মুখের ভাষা শক্তিহীন। আর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘোড়া এই ক্ষেত্রে খোঁড়া। ইহাই যথেষ্ট যে, এই ইশক (প্রেম) অবশিষ্ট ও স্থায়ী। আর বাকি সব ক্ষণস্থায়ী খেলা সদৃশ। কেননা, রূপক প্রেম; যেটি সুন্দর গুণাবলী, কর্ম ও বিভিন্ন নিদর্শন সমূহ থেকে সৃষ্টি হয়, এই ক্ষেত্রে ইহা পতিত ও ধ্বংসশীল। কেননা আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী সর্বদা তাঁর গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা নতুন নতুন তজল্লি (জ্যোতি) ছড়ান। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "তিনি সর্বদাই কোনো না কোন কাজে রত আছেন।" (সূরা রহমানঃ ২৯)। তাঁর (আল্লাহ) থেকে বিভিন্ন গুণাবলী, কর্ম ও বিভিন্ন নিদর্শন সমূহ প্রকাশ্যে রূপ লাভ করে। যখন তাঁর গুণবাচক নাম সমূহের তাজল্লির (জ্যোতি) প্রভাবের কারণে রূপক প্রেমাস্পদের হাসনে (সৌন্দর্য্য) পরিবর্তন আসে, তখন তাদের (প্রেমাস্পদগণ) গুণাবলী, কর্ম ও বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে তাজল্লির ভিন্নতার কারণে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কেননা তাদের গুণাবলী, কর্ম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকৃত দর্শকের গুণাবলী, কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপ। তাই জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

জগতের ক্ষুদ্র কণাগুলো থেকে যে দর্পন সমূহ তৈরি হয়,
সেখানে নিজের চেহারার প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়।
তাঁর (আল্লাহ) সৌন্দর্যে প্রত্যেক স্থান আলোকিত,
এতে জগতের প্রেমাস্পদদের সম্পর্ক স্থাপিত।

এই ক্ষেত্রে রূপক প্রেমিকগণ বিষন্ন হৃদয়ের অধিকারী হবে। উষ্ণ প্রেম তাদের হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। আর তারা নিজেরা চিরস্থায়ী ক্ষতি ও

স্থায়ী বঞ্চনার জেলখানায় বন্দী হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে উহা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। বিপরীতপক্ষে, ঐ সমস্ত হযরতগণ; যাঁরা প্রকৃত সত্তার সুদৃঢ় প্রেম লালন করেন এবং তাঁর গুণাবলী সমূহ, কর্মসমূহ ও নিদর্শন সমূহকে প্রকৃত সত্তার আলোক রশ্মি ও তাঁর অনুগামী মনে করে সম্ভাব্য চাক্ষুষ্মান আকৃতি ও অবয়ব সমূহকে প্রকৃত সত্তার আয়না বানিয়ে নেন। আর প্রকৃত সত্তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে উক্ত দর্পন সমূহের মধ্যে দর্শন করেন।

কবিতা

তুমি দর্পন, সে দর্পনের শোভা- তুমি গুপ্ত, সে ব্যক্ত।

আর এই রূপক প্রেম সদৃশ সম্ভাব্য চাক্ষুষ অবয়বাদিকে প্রকৃত সত্তার প্রেমের সেতু মনে করেন। কেননা- "রূপক হল প্রকৃত বস্তুর সেতু"। আর উক্ত রূপক প্রেমের সেতু দ্রুত অতিক্রম করে প্রকৃত সত্তার ইশক (প্রেম) এর দিকে অনুসন্ধিৎসু থাকেন।

কবিতা

প্রেমিকের উচিত যে, বাহ্যিক আকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া,
এই (বাহ্যিক আকৃতি) সেতু দিয়ে নিজে দ্রুত অগ্রসর হবে।
যদি তুমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে চাও,
তাহলে সেতুতে থামা উচিত হবে না।

দুনিয়া অবয়বধারী দূর্গ সদৃশ; যা মানুষের অবয়ব দ্বারা পূর্ণ। অথবা দুনিয়া জুলেখার অভিসার কক্ষ সদৃশ, যেখানে সমস্ত ছবিগুলো ইউসুফ (আলাইহিস্‌সালাম) ও জুলেখার ছিল। অনুরূপভাবে, দুনিয়ার মধ্যে মানুষের সব অবয়বসমূহ খোদা ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশেক-মাশুক। যারা তাদেরকে (মানব) দেখবে খোদা ও রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখবে। এতদ্‌প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে (আলাইহিস্‌সালাম) রহমান (আল্লাহ) এঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন"।

পংক্তি

তুমি ভিন্ন যা কিছু এই জগতে পরিদৃষ্ট হয়,
নিশ্চিতভাবে হাকিকি জগতের ছায়া।

বর্ণিত আছে যে, যখন নবী হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর সন্তানগণ হযরত ইউসূফ (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সহোদর ভাই ইবনে ইয়ামীন (আলাইহিস্‌সালাম)কে সাথে নিয়ে কিনান থেকে মিশর দেশে পৌঁছেন। হযরত ইউসূফ (আলাইহিস্‌সালাম) তাঁকে (ইবনে ইয়ামীন) আযীয মিশরের পোশাক পরিধান করাইয়ে একটি সুউচ্চ স্থানে

সম্মানিত আসনে উপবেশন করালেন। আর রাজ দরবারের পরিচারকদের একটি দলকে তাঁর সেবার জন্য নিয়োগ করলেন। ইমাম খলফ সিজিস্তানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, উক্ত প্রসাদকে হযরত ইউসূফ (আলাইহিস্সালাম) মরমর পাথর দ্বারা বানিয়েছিলেন। উহার দৈর্ঘ্য ৪০ গজ ছিল এবং উক্ত ঘরের দরজা ও প্রাচীর হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্সালাম) ও তাঁর সমস্ত সন্তানগণের ছবি দ্বার নকশাকৃত ও সুসজ্জিত ছিল। সমস্ত বিগত ঘটনাবলী যা হযরত ইউসূফ (আলাইহিস্সালাম) এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল তা বিস্তারীত লিপিবদ্ধ ছিল। কাউকে ছবি অংকন করে এবং কাউকে ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিপিবদ্ধ করে দেখানো হয়েছিল। মূলতঃ এগারো ভাইয়ের আকৃতি ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী নকশাকৃত ছিল। যেন উক্ত প্রাসাদের প্রত্যেক দরজা ও প্রাচীর নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের প্রতিফলন ছিল। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি- সবই এতে রয়েছে।" (সূরা কাহাফ: ৪৯)। আর প্রাসাদের প্রতিটি নকশা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের দিকে ইঙ্গিত করছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা বণি ইসরাইল: ১৪)।

আরবি পংক্তিমালা

আমার পাপ আমার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে,
অতএব আগামী বিচার দিবসে আমার কোন অভিযোগ নেই।
(সেদিন হাশরের দিন সম্বোধন করে বলা হবে) ইহা তোমার আমলনামা
ইহাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নাও এবং তা পড়ে দেখ,
তোমার আমলনামা তোমার গোনাহ সমূহকে প্রকাশ করে দিয়েছে।
অতএব, অনেক যুবক ব্যক্তি স্বীয় যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে হায় যৌবন!
হায় যৌবন করে চিৎকার করতে থাকবে অর্থাৎ অনুশোচনা করবে,
অনেক বৃদ্ধ তাদের হারিয়ে যাওয়া যৌবনের জন্য কান্নাকাটি করবে।
অতঃপর বলবে, হে দয়ালু! হে অনুগ্রহকারী! ক্ষমা করুন,
অতএব, উত্তপ্ত দিনে (কিয়ামতের দিন) আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

যখন হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর ভাইগণ উক্ত নকশাকৃত ঘরটি সুন্দর নকশা দ্বারা নকশাকৃত দেখলেন এবং উক্ত ঘরের দরজা ও প্রাচীরকে নিজেদের অবস্থার দর্পন হিসেবে পেলেন, তখন তাঁদের এই পরিমাণ লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে ও মুখে কথা বলতে অক্ষম হয়ে গেলেন। অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরে তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন। ইত্যবসরে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর নির্দেশ অনুযায়ী

প্রধান বাবুর্চি তাঁদের জন্য খাবারের দস্তর খানা উপস্থিত করলেন। তাঁরা খাবার গ্রহণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। প্রধান বাবুর্চি তাঁদের বিষন্ন অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা? তাঁরা উত্তর দিলেন, আমাদের সাথে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের একটি ঘটনা ছিল যেটা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। এই সময়ে এই ঘরের দরজা ও প্রাচীরের নকশা সমূহে আমাদের অবস্থা দর্পনে দেখে আমাদের বিরহের আগুন ও প্রেমের স্ফুলিঙ্গ এতটাই প্রজ্জ্বলিত যে, পানাহারের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ইহা বলে চক্ষু থেকে অনুশোচনার অশ্রু ভাসাতে লাগল। আর চাইল যে, সেই প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যাবেন। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) তৎক্ষণাৎ তাঁদের অবস্থা অবগত হয়ে নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁদেরকে উক্ত নকশাকৃত ঘর থেকে বের করে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) নিজেই উক্ত ঘরে আগমন করে ভাইদের সাথে খাবার গ্রহনে শামিল হলেন। এই অবস্থায় হযরত ইবনে ইয়ামীন খাবার গ্রহণে বিরত রইলেন। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রিয় ভাই, তুমি কেন খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নিলে? তিনি উত্তর দিলেন, হুজুর আমার অন্তর খাবার খেতে চায় না। আমাকে অনুমতি দিন যাতে পুণরায় আরেকবার নিজের ভাইয়ের সুন্দর ছবি দর্শন করে অন্তরের চক্ষুকে প্রশান্ত করি এবং বিচ্ছেদের অগ্নি শিখাকে অশ্রুসিক্ত চোখের জ্বলে সিক্ত করি।

কবিতাংশ

হে আমার বন্ধু! এই যৌবনে আমি বন্ধুকে খুঁজছি,
আমি বন্ধুর গলিপথে ঘুরে বেড়াই এবং তাঁর প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে থাকি।
বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্ষুদ্র কণা তাঁরই (আল্লাহ) নিদর্শন,
আয়নাতে যখন আমি মুখ দেখি, তখন ঐ বন্ধুকে দেখি।

হযরত ইউসুফ সিদ্দীক (আলাইহিস্সালাম) তাঁকে অনুমতি প্রদান করতঃ একজন খাদেম সহ তাঁকে উক্ত নকশাকৃত প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন। ইবনে ইয়ামীন ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর ছবিকে সামনে নিয়ে বসলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করলেন। ঐদিকে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) স্বীয় সন্তান আফরায়েমকে উক্ত প্রাসাদে পাঠিয়ে বললেন, হে স্নেহাস্পদ সন্তান! তুমি আপন চাচা ইবনে ইয়ামীনের কাছে গিয়ে বস। তোমাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করবে তুমি হিব্রু ভাষায় সুস্পষ্টভাবে তার উত্তর দিবে। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কার ছেলে। তখন তুমি বলবে যে, আমি ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর স্নেহাস্পদ সন্তান। এখন সময় হল যে, চেহারা থেকে পর্দা উম্মোচন করা হোক এবং বন্ধুর চেহারাতে নুরের ঝলক দেখানো হোক। কিন্তু কখনো প্রতিটি দর্পন

এই রহস্য অন্যদের উপর প্রকাশ না করে এবং জ্যোতিকে বেগানা লোকদের নজর থেকে লুকিয়ে রাখবে। আফরায়েম দয়ালু পিতার নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত নকশাকৃত প্রাসাদে আগমন করে সালাম প্রদান করেন এবং স্বীয় চাচা হযরত ইবনে ইয়ামীনের পাশে বসে গেলেন। হযরত ইবনে ইয়ামীন একবার দেওয়ালের ছবির দিকে তাকান এবং একবার স্নেহাস্পদ আফরায়েম- এর চেহারার দিকে তাকান। উক্ত দুটি আকৃতির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখে ও পূর্ণ সম্পর্ক দেখে আফরায়েমকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তুমি কে? তুমি কার সন্তান? তখন আফরায়েম হিব্রু ভাষায় বললেন, হে সম্মানিত চাচা! আমি হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর স্নেহাস্পদ ও কলিজার টুকরা সন্তান।

ইবনে ইয়ামীন বললেন, হ্যাঁ! খোদার পয়গাম্বর হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) তাঁর নাম। ইবনে ইয়ামীন ইহা শুনে কান্না করতে লাগলেন। আফরায়েম জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমার একভাই যাঁর নামও একই (ইউসুফ) ছিল। আফরায়েম বলল, চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি তাঁর স্নেহাস্পদ সন্তান হই। ইবনে ইয়ামীন ইহা শুনতেই নিজের জায়গা থেকে লাফ দিয়ে তড়িৎ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আফরায়েমকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাঁর মাথা ও কপালে চুমু খেয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি সত্য বলতেছ। তোমার কাছে আমার ভাইয়ের সুগন্ধ পাচ্ছি। এখন তোমার পিতা কোথায়? আফরায়েম বলল, ঐ সময় আপনার সাথে বসে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি আমার পিতা। ইবনে ইয়ামীন বললেন, তিনি তো আযীয মিশর ছিলেন। আফরায়েম বলল, তিনিই আমার পিতা। ইবনে ইয়ামীন বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। আফরায়েম বলল, খুব ভাল। প্রথমে আমি তাঁর থেকে অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা বলে আফরায়েম স্বীয় পিতার কাছে গিয়ে আরজ করলেন, হে দয়ালু পিতা! আমি স্বীয় চাচা ইবনে ইয়ামীনের কাছে হুজুরের (ইউসুফ আঃ) সমস্ত রাজ রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছি। এখন তিনি আপনার সাক্ষাত প্রার্থী। ইউসুফ (আঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। আফরায়েম ইবনে ইয়ামীন এর কাছে এসে বললেন, চলুন এবং চক্ষুকে স্বীয় মাহাবুব (প্রেমাস্পদ) এর সৌন্দর্য্য দর্শনে আলোকিত করুন। যখন ইবনে ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আঃ) এঁর একান্ত সন্নিধানে আসলেন, হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) দাঁড়িয়ে সুন্দর চেহারার পর্দা উন্মোচিত করে ইবনে ইয়ামীনকে নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন "নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।" (সূরা ইউসুফ: ৬৯)। নিশ্চয় আমি তোমার ভাই। অতএব, তুমি দুঃখ করোনা ঐ ব্যাপারে যা তাঁরা করেছিল।

যখন ইবনে ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর কপাল মোবারক খুব মনোযোগ সহকারে দেখলেন এবং চিনে গেলেন তখন স্বীয় চিন্তিত হৃদয়ের চক্ষু দ্বারা এমন একটি শ্লোগান দিলেন যাতে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন যে, ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) তাঁর মাথাকে স্বীয় কোলে নিয়ে তাতে ফুলের সুবাসযুক্ত পানি ও কর্পুর ছিটাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি (বিন ইয়ামীন) চাইলেন যে, পূর্ণ আনন্দ ও অত্যধিক খুশিতে আরেকটি শ্লোগান দিবেন। সেই মুহূর্তে ইউসুফ (আঃ) ইরশাদ করলেন, সাবধান! ইহা ধৈর্য্যহীনতা ও দূরদৃষ্টিহীনতার সময় নয়। এমন যেন না হয় যে, ভাইদের কাছে তা জানা হয়ে যায়। কেননা, এখন পর্যন্ত অনুমতি নাই যে, আমি নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করব। বর্ণিত আছে যে, উক্ত সময় ইবনে ইয়ামীনের কাছে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, সীমাতিরিক্ত আনন্দ ও অত্যন্ত খুশির কারণে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন।

কবিতাংশ

আনন্দঘন এই মুহূর্ত। কেননা সে বন্ধুর প্রেমে পড়েছে,
সে আকাংখিত সে ছবির পাশে পৌঁছে গিয়েছি।
এই খাঁচায় বন্দি পাখি ব্যতিত ফুলের মূল্য কেউ জানে না,
কেননা হেমন্তের পর ফুলের বসন্ত আসে।
ইশকের আগুনে দগ্ধ হওয়া ব্যতিত মিলনের স্বাদ লাভ করতে পারে না,
কেননা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে বন্ধুর কাছে পৌঁছা যায়।

তত্ত্বজ্ঞানী ও গভীর অনুসন্ধানী

তত্ত্বজ্ঞানী ও গভীর অনুসন্ধানীগণ এই পর্বে তাঁদের চমৎকার বর্ণনা ও ইঙ্গিত দ্বারা ইবনে ইয়ামীনের ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর সাথে মিলিত হওয়াকে আল্লাহ তায়ালার একত্বের সৌন্দর্য্যের প্রেমে মিলিত হওয়ার এবং তাঁর হাকিকতে মিলন লাভ করার রাস্তা হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, জামালিয়তের (সৌন্দর্য) অধিকারী হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর সাথে মিলিত হওয়ার সূচনাটা ছিল এই যে, প্রথমে তিনি ভাইদেরকে নকশাকৃত প্রাসাদে নিয়ে যান; যেখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের ছবি অংকিত ছিল এবং অনুগত, অবাধ্য, পাওনাদার ও বিচারকের অবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল। ভাইদের মধ্যে কতেকের উক্ত ছবিগুলোর ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল না। ফলে তাঁরা উক্ত স্থান থেকে চলে গেলেন।

উক্ত দশ ভাই ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর ব্যাপারে জানতেন না, যার কারণে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর সম্মান তাঁরা বুঝতে পারেননি। সৌন্দর্য

দর্শনের গভীর অনুসন্ধান ও বন্ধুর সাথে মিলনের আনন্দের হাকিকত তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। আর অন্য ভাইদের মধ্যে কতেক উক্ত নকশাকৃত প্রাসাদে প্রেমাস্পদের ছবি দর্শনে মিলনের আশির্বাদপুষ্ঠ হয়ে সুশোভিত হলেন। আর উক্ত মর্মার্থের প্রকাশস্থল ইবনে ইয়ামীনই ছিলেন। কেননা, তিনি রাজ-রহস্যের অনুসন্ধানী ও মিলনের প্রত্যাশী হয়ে গেলেন। অনুরূপভাবে, প্রতিশ্রুতি দিবসে আত্মাসমূহকে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর ভাইদের মত নকশাকৃত একটি ঘরে আনয়ন করে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর আকৃত-প্রকৃতি তাদের উপর প্রকাশ করেন। কতেক আত্মার কাছে বাদূড়ের মত খোদায়ী নূরের তজল্লি (দ্যুতি) বহন করার শক্তি ছিল না। তাদের উপর উক্ত নুর বিকিরণ করা থেকে তারা পলায়নপর হল। উক্ত পলায়নপরতার কারণে 'তারা আগুনের জন্য' এই তরবারি সম বাণীর যখমে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কতেক যারা উচ্চ উদ্যম ও সুউচ্চ সহনশীলতার অধিকারী ছিলেন। ইবনে ইয়ামিনের মত সৃষ্টিকর্তার নাম ও গুণাবলী সমূহের নুরের পানপাত্র দ্বারা পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলেন। 'তারা বেহেশতের জন্য ' এই প্রশংসার সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত হলেন। প্রথম দলটি অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হল এবং দ্বিতীয় দলটি প্রেমিক হিসেবে গণ্য হল। অস্বীকারকারীগণ অজ্ঞানতার অত্যাধিক অন্ধকারের কারণে ঐ নুরের যোগ্যতা রাখে না। আর আশেকগণ অত্যন্ত স্বচ্ছতা দ্বারা মহান প্রভূর নূরি শক্তি ধারণ করতে পারেনি। চিরঞ্জীব প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উক্ত নকশাকৃত ঘর থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশ ও মাতার জরায়ুর নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে আসলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি একটি নিয়ম তান্ত্রিকতা প্রদান করেন। তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য ইবনে ইয়ামীনের মত সামনের সারিতে আশেক ও দরিদ্রদের রাখলেন । 'আমি কি তোমাদের প্রভূ নই' এই বাণীর নকশাযুক্ত ঘরে তাঁরা খোদায়ী সৌন্দর্য্যকে অবলোকন করছিলেন এবং ইশক (প্রেম) ও ভালবাসার ধ্বনি ও আহবান শুনেছিলেন। তারা উক্ত খেয়ালের আকাংখায় জান প্রাণে উৎসাহী।

উক্ত বিচ্ছেদের অবস্থায় স্বীয় সামর্থহীনতা দ্বারা খোদায়ী নকশাযুক্ত ঘরকে অবলোকন করছিল না এবং তাঁর অনুগ্রহকে মানছিল না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ হল- হে ফেরেশতাগণ জেনে রেখ! আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য সৎকর্মশীলদের আকাংখা দীর্ঘ এবং আমি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি আকূল। এখানে উক্ত বাণীরই বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। কেননা, আশেকদের আত্মা সমূহকে স্বর্ণমণ্ডিত ঘরের ছবিতে ধারণ কর অর্থাৎ দেহ কাঠামোতে ধারণ কর নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম অনুযায়ী। আল্লাহ ইরশাদ করেন - "অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন।" (সূরা গাফিরঃ ৬৪)। নিম্নোক্ত বাণী অনুযায়ী

"আল্লাহ তায়ালা আদমকে তাঁর স্বীয় আকৃতির সৃষ্টি করেছেন" এই বাণী মতে পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্যকে দর্শন কর। আর আমাদেরকে অদৃশ্য প্রেম প্রেম খেলার ফেরাশতাগণ ইবনে ইয়ামীন রূপী রূহ সমূহকে দেহ কাঠামোতে নিয়ে আসবেন। যেরূপ ওখানে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) আফরায়েমকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে (ইউসুফ আঃ ও আফরায়েম) পিতা ও সন্তান সম্পর্কের ছিলেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা আফরায়েম রূপী ইশক (প্রেম) ও ভালবাসাকে ইবনে ইয়ামীন রূপী রূহের নিকট প্রেরণ করেন। কেননা, ইহার (ইশক) ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে সিফত (গুণ) ও মওসুফ (গুণান্বিত) এর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেরূপ, ঐখানে আফরায়েম বহুরূপী পোশাক দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন। আর এখানে ইশক (প্রেম) নিজেকে ব্যাথা ও দহনের গোপন পোশাক দ্বারা সুসজ্জিত করল এবং সম্মানের পোশাক পরিধান করল। আর ইজ্জতের টুপি মাথার উপর রাখল এবং কাজের ছাপকে ফেলে দিয়ে হৃদয়ের দরজা দিয়ে প্রকাশ হল। আর ইবনে ইয়ামীন রূপী রূহকে সালাম করল। তাই হযরত মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন - 'প্রেম এল সদর দরজা দিয়ে। সে বলল তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

ইশক দরজায় এসে বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক,
ইশক বিদায় নেওয়ার সময় বলল, তোমার উপর সালাম বর্ষিত হোক।
তার অনুসন্ধানে অর্ধ রাত্রিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল,
বন্ধু যখন দর্শন দিল, অনুসন্ধানের উত্তরে বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আমি বিরহ বেদনায় রক্তিম বর্ণের হয়ে গেলাম এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত আশেকে পরিণত হলাম,
সে দেখল আমি পাগল হয়ে গেছি এবং বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আমি তোমার কারণে নিপীড়নের শিকার হলাম এবং তোমার মমতায় ডুবে গেলাম,
কারণ সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তখন ইশক বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ইরাকী রূহুল্লাহ প্রণীত

কবিতা

ইশকের শরাবের পিয়ালা কি শরাবে পূর্ণ অথবা সূর্য মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে।
ইশকের শরাবের পরিশুদ্ধতা ও পাত্রের কোমলতার কারণে মদ ও পেয়ালার বর্ণের সাথে আমরা মিশে গেলাম।
সবখানে শরাবের পেয়ালায় পূর্ণ, যদিও কোনও শরাব নেই,
অথবা শরাব আছে, যদিও কোন শরাবের পেয়ালা নেই।

হাঁ, ইশক (প্রেম) মা'শুক (প্রেমাস্পদ) এর সিফত (গুণ) বিশেষ। আর সিফত জাতের (সত্তা) অন্তর্ভূক্ত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য।

পংক্তি

তোমার দরবারে দ্বৈত সত্তার কোন স্থান নেই,
সমস্ত জগত তোমার (ইশক) কারণে সৃষ্টি; যা তোমার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

সেই কারণে ইবনে ইয়ামীন আফরায়েমকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। কেননা, তোমার কাছে স্বীয় মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর সুগন্ধি পাচ্ছি। অনুরূপভাবে, ইশকের সাথে আশেক (প্রেমিক) এর একই সম্পর্ক বিদ্যমান।

পংক্তি

বুক থেকে অদ্ভূত এক নিঃশ্বাস শুনতে পাই,
অন্তর থেকে বন্ধুর কথা আমি শুনতে পাই।
এখানে সবটাই ইশকের সুগন্ধি থেকে উৎসরিত,
হে ইশক! আমি তোমার মধ্যে কারো সুগন্ধি পাই।

এখন হে ইশক বলে দাও যে, আমার প্রেমাস্পদ কোথায়? কেননা অন্য কোন বিরহ ও বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতে পারবো না।

পংক্তি

হে ঐ বসন্তের বাতাস! আমাকে জানতে দাও তা কতদূর,
হে চিত্রশিল্পী! আমাকে জানতে দাও তা কতদূর।
আমি ফুলের মত বিরহের সূর্য দ্বারা নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছি,
ওহে গোপন রহস্য ও ছায়ামূর্তি! আমাকে খবর দাও তা কতদূর।

ইশক বলে, হে আশেক! তোমার প্রেমস্পদ সর্ব মুহূর্তে তোমার সাথে আছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি উহারই সুউচ্চ প্রতিধ্বনি ও আহবান। আল্লাহ ইরশাদ করেন,"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা ক্বাফ: ১)। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আর আমার বান্দা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)। উক্ত বাণীর মর্ম অনুযায়ী তিনি (আল্লাহ) সর্বদা তোমার সাথে কথা বলছেন। আর বিদ্যমান সত্তার দর্পনে তাঁর সৌন্দর্যের দর্শন তোমার সামনে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান।

কবিতাংশ

হে আশেক! স্বীয় প্রেমাস্পদ ছাড়া তুমি অন্য কারো কাছে কেন চাও?
যদি খোদার বান্দা হও, তাহলে সবকিছু তাঁর কাছে চাও।

নিজের দিকে তাকাও, প্রেমাস্পদ তোমার নিকটে,
তবে অন্য কারণ খুঁজ কেন তুমি?
মূর্খরা দুনিয়া তালাশ করে, জ্ঞানীরা পরকাল তালাশ করে,
হে আশেক! প্রভুর কাছে দিলওয়ালাকে (আল্লাহওয়ালা) তালাশ কর।
খোদার আরশের ব্যাপারে অবগত এবং পৃথিবীর সম্পর্কে প্রভাবিত,
তোমার নিজের ব্যাপারে সাবধান থাক, তবে অন্যের ব্যাপারে তোমার কি খবর থাকবে?

যেরূপ, ঐখানে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর অনুমতিক্রমে আফরায়েম ইবনে ইয়ামীনকে ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর নির্জন প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সার্বিকভাবে তাঁকে (ইবনে ইয়ামীন) বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি (ইউসুফ আলাইহিস্সালাম) বললেন,"নিশ্চই আমি তোমার সহোদর । অতএব, তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।"(সূরা ইউসুফ: ৬৯)। এখানেও ইশক (প্রেম) আভ্যন্তরীন ইঙ্গিতবাহী চাহিদা মোতাবেক পর্দা সমূহকে আশেকের দৃষ্টির সামনে থেকে উঠিয়ে দেয়। এমনকি সবুজ বৃক্ষের অবস্থান থেকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে তার (আশেক) কাছে মাশুকে হাকিকী (প্রকৃত প্রেমাস্পদ) এর আহবান পৌঁছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন "নিশ্চয় আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই"।

পংক্তি

যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে তাহলে বাহিরের দিকও পরিষ্কার,
তবে তুমি নিজের মধ্যে 'আমি আল্লাহ' ধ্বনি শুনতে পাবে।
দেহের কারাগার থেকে প্রাণের মহাবিশ্বে উপস্থিত হও,
হৃদয়ের রন্ধ্র দিয়ে তাঁর (আল্লাহ) উপস্থিতি লক্ষ্য কর।
বিরহ বেদনার অন্ধকার রাত পেরিয়ে বরকতময় ইশকের উদয়স্থলে প্রবেশ কর,
আশ্চর্যান্বিত হয়ো না, তুমি এক ও অদ্বৈত সত্তার প্রতি মাথা অবনত কর।
তোমার অন্তরের চোখ দ্বারা আবে হায়াত (অমৃত) লাভ কর,
কেননা প্রেমাস্পদ ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) কুপ থেকে উঠে এসেছেন।
তুমি উদাসীন, খোদায়ী সত্তার গুপ্ত রহস্যের বিকাশ সম্পর্কে কি জান?
গুপ্ত রহস্য জানা ব্যতিত তাঁর (প্রেমাস্পদ) বিকাশমানতা সম্পর্কে জানতে পারবে না।

দৃষ্টিসম্পন্ন ও সচেতন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা ছয়টি দিককে স্বীয় জাতের (সত্তা) প্রকাশস্থল বানালেন। সেই জন্য স্বীয় পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন-"অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।"(সূরা বাকারা:১১৫)। প্রত্যেক দিকে আল্লাহ কিবরিয়ার

একত্ববাদের সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। যে আল্লাহ্‌র সত্তায় ফানা (বিনাশ) হয়ে গেছে, সে নিজের আকৃতিকে আল্লাহ তায়ালার হাকিকী ছুরতে অবলোকন করে। আর আল্লাহর সৌন্দর্য্যকে রূপক প্রেমাস্পদদের আকৃতিতে বিশেষ করে নারীদের আকৃতিতে এইভাবে দেখে যেরূপ চন্দ্রালোককে পানির মধ্যে দেখা যায়। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন -

কবিতা

সে হুরের চেহারায় খোদার সৌন্দর্য দর্শন করল,
যেরূপ চন্দ্র পানিতে পরিদৃষ্ট হয়।

সব আকৃতি বা ছবি অবয়বহীনতা হতে সৃষ্টি হয়। অদৃশ্যের পর্দা দ্বারা অবয়বহীনতা স্বীয় ছবি দর্শনের দর্পন তৈরি করে। যাতে প্রত্যেক ছবি সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দ্বারা অনুগ্রহ লাভকারি হয়। হযরত রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

কখনো কখনো ঐ অবয়বহীনতা অদৃশ্যের পর্দা হতে তৈরি হয়,
প্রত্যেক ছবি বা অবয়ব বিকশিত হয় খোদার অনুগ্রহে।
যাতে প্রতিটি দৃশ্যমান ছবি বা আকৃতি থেকে সাহায্য লাভ করা যায়
পরিপূর্ণভাবে ও খোদায়ী কুদরতের সৌন্দর্য দ্বারা।

আরেফ জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

তুমি যদি তাঁর পথে কোন বাঁধা দেখ, তবে তিনি তা স্থাপন করেছেন,
তুমি যদি কোথাও প্রেমে পড় তবে এটা তাঁর শিকার।
তাঁর ইশকে অন্তর সতেজতা লাভ করে,
তাঁর বাসনায় প্রাণ হয় সফলকাম।
অন্তরঙ্গতা চিত্তহারী মনোহর আশেকের খনি,
সে জানুক বা না জানুক সে হল আশেক (প্রেমিক)।

রূপক প্রেম প্রকৃত প্রেমের জন্য অসীলা ও সেতু স্বরূপ। কেননা প্রবাহমান সমুদ্রের গভীর পানিতে প্রত্যেক ডুবন্ত যুবক ও বৃদ্ধ উক্ত রূপক সেতুর অসীলা ছাড়া প্রকৃত প্রেমের বৈঠক ঘর পর্যন্ত পৌঁছা কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব। সেই জন্য আরেফ জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতাংশ

সমগ্র জগতের সম্পর্ক ইশকের গভীর সমুদ্রের সাথে,
আর তাতে প্রতিটি যুবক ও বৃদ্ধ নিমজ্জিত।
তুমি যদি সেতু ছাড়া সমুদ্র পার হতে চাও,
তাহলে ইশককে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ কর, তবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

যদিও ইশকে মাজাজি (রূপক প্রেম) হয় তা থেকে মুখ ফিরাইও না,
কেননা উহা (রূপক প্রেম) প্রকৃত প্রেমের কর্মপন্থা নির্দেশকারী।
কাপ ব্যতিত শরাবের আকৃতি কল্পনা করা যায়,
কিন্তু শরাবের স্বাদ আস্বাদন করা যায় না।

কেননা প্রত্যেক অনভিজ্ঞ ও অপক্ব ব্যক্তিদের জন্য নবীগণের (আলাইহিস্সালাম) আকৃতি বা অবয়ব ব্যতিত অন্য কোন আকৃতি বা অবয়ব থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। যেহেতু তাঁরা (নবীগণ) আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত ও পথ নির্দেশের জন্য মনোনীত হয়ে এসেছেন। যদি একটি অপরিপক্ব বা অনভিজ্ঞ আকৃতি বা অবয়ব (ব্যক্তি) অন্য অনভিজ্ঞ আকৃতি (ব্যক্তি) থেকে পূর্ণতা প্রত্যাশী হয় এবং রূপক প্রেমের উপর পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং ইশকে হাকিকি (প্রকৃত প্রেম) এর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে তাহলে ইহা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

একটি আকৃতি অপর আকৃতি দ্বারা পূর্ণতা পায়,
যদি একটি অপরিপক্ক আকৃতি বা ব্যক্তি অপর অপরিপক্ক আকৃতি বা ব্যক্তি থেকে পূর্ণতা তালাশকারী হয় এবং রূপক প্রেমের উপর পরিতৃপ্তি লাভ করে,
তাহলে তা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

কেননা প্রকৃত চন্দ্রালোকের আলোর তুলনায় রূপক প্রেমিকদের অপরিচ্ছন্ন দেহ উজ্জ্বল মেঘের মত। কেননা উহার (চাঁদ) সৌন্দর্য্যের আলো থেকে রূপক প্রেমিকদের দেহ মেঘ চমকাচ্ছে। উহার (রূপক প্রেম) সৌন্দর্য্য ও শোভা প্রকৃত চাঁদ থেকে ধার স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ মেঘের মত। কেননা, চাঁদ "তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব।" (সূরা হিজরঃ ২৯)- এই আয়াতের মর্মমতে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। যদি রূপক প্রেমিকের কাছে পার্থিব বস্তুকে ত্যাগ [দুনিয়া বিমুখতা], মোহাবিষ্ট অবস্থা ও ফানা (বিনাশ) অর্জিত থাকে, তখন তার দৃষ্টি চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর অপরিচ্ছন্ন দেহ মেঘ সূক্ষ্ম ঘরের চাঁদের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে যায় এবং যদি অপরিচ্ছন্ন দেহ-মেঘের অবস্থা তাতে অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে উক্ত অবস্থায় ইহা হল সায়রে তাসবিহা (সদৃশ ভ্রমণ) এর আকৃতিতে সায়রে তানযিহা (পবিত্র ভ্রমণ)।

কবিতাংশ

যদি পর্দাবিহীন দেখার সামর্থ না রাখ, তাহলে তাঁর সত্তার আলোক রশ্মির দিকে তাকাও,
জগতের ক্ষুদ্র কণাগুলোর দিকে তাকাও, কেননা প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা হল তাঁর সত্তাকে দেখার দর্পন।

খোদার জামালিয়ত (সৌন্দর্য) তাঁর গুণাবলী দর্শনের দর্পন দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, খোদার গুণাবলী কথা ও কর্মের পোশাকে তাঁর নিদর্শনাবলীকে প্রকাশ করে। তোমার দেহ যেরূপ প্রাণের বিকাশস্থল, তোমার প্রাণও হাকিকতের বাস্তব বিকাশ, যেমন হাকিকত তাঁর নামকে প্রকাশ করে এবং নাম তাঁর সত্তাকে প্রকাশ করে।

যদি (আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি) দেহ মেঘ প্রাণের চাঁদকে আড়াল করে ফেলল এবং আর প্রবৃত্তির চাহিদা; যার বর্ণনা নিম্নোক্ত বাণী- "সবচেয়ে বড় শত্রু হল তোমার নফ্‌স যা তোমার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী অবস্থিত।" ইহা (প্রবৃত্তির চাহিদা) প্রাণের উপর প্রবল হয়ে গেল। আর রূপক প্রেমিকদের ধার করা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও শোভাকে স্বতন্ত্র বা মূল সৌন্দর্য মনে করল। ইহা রূপক প্রেমিকদের বাহ্যিক সৌন্দর্যকে দেখে পরিতৃপ্ত ও বাহ্যিক প্রেমের কারাগারে বন্দী থেকে গেল। তবে ইহা সর্বত্র পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। কেননা, বাহ্যিক অবয়ব বিশিষ্ট পার্থিব বস্তুর দূর্গের পাঁচটি দরজা রয়েছে, যেগুলোকে বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। আর এইগুলো আলমে শাহাদত (দৃশ্যমান জগত) এর দিকে উম্মুক্ত থাকে। আর পাঁচটি গোপন দরজা রয়েছে যেগুলোকে গোপন পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এইগুলো অদৃশ্যের অদৃশ্য একত্ববাদের জগতের দিকে উম্মুক্ত। অতএব, হে প্রিয় বন্ধু! তুমি এই প্রকাশ্য অবয়বের শরাবে (মদ) পূর্ণ মাতাল হয়ে যাইও না। কেননা ইহা সুস্পষ্ট প্রতিমা পূজা ও মূর্তি তৈরি। এই আকৃতি অস্থায়ী। কেননা, পারস্পরিক তজল্লি (দীপ্তি) সমূহ দ্বারা যখন ইহার সৌন্দর্য্যের দর্পন নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়ের মর্ম অনুযায়ী ধূলাবালি দ্বারা ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে । আল্লাহ ইরশাদ করেন- "আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।" (সূরা ত্বীনঃ ৪), "আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৬৮)। তখন উক্ত বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা স্থায়ী ক্ষতি ও বঞ্চনার ফলাফল অর্জিত হবে। উচিত হবে যে, আল্লাহ্‌র দিকে মুখাপেক্ষী হবে যাতে প্রকৃত সৌন্দর্য অর্জন করবে এবং আসল মর্মার্থের দিকে পৌঁছাবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন আদম (আলাইহিস্‌সালাম) কে সিজদা না করার কারণে ইবলিশকে নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মমতে অভিসম্পাতের হার তার কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।" (সূরা ছোয়াদঃ ৭৮)। তখন সে আদম (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর বংশধরগণকে তার প্রতারণার ফাঁদে ফাঁসানোর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রবঞ্চনা করার আবেদন করল। তখন পরাক্রমশালী খোদা তায়ালা তাকে [ইবলিশ] স্বর্ণ, রৌপ্য, সম্পদ ও পার্থিব ধন সম্পদের ফাঁদ

দেখালেন। তখন এই অভিশপ্ত ইবলিশ পেরেশান হয়ে ইহার চেয়ে আরেকটু কঠিন অন্য একটি ফাঁদ চাইল। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে দামী পাথরের খনি দেখালেন। ইহাতেও সেই অভিশপ্ত রাজি হলো না এবং সেই আবেদন করল যে, হে খোদা! ইহার চেয়েও মজবুত ফাঁদ চাই। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে (ইবলিশ) মদ ও কাবাব পানাহারের সরঞ্জামাদি পেশ করলেন। সেই অপরাধী উহাতেও রাজি না হয়ে পুণরায় আবেদন করল যে, হে খোদা! ইহার চেয়েও শক্ত ফাঁদ আবশ্যক।

সেই সময় আল্লাহ তায়ালা মদের ঘর, আফিম জাতীয় মদ্যশালা ও অনর্থক বাজি ধরার সরঞ্জামাদি তাকে অর্পন করেন। তখন এই অভিশপ্ত একটু খুশি হয়ে হেঁসে আবেদন করল যে, হে খোদা! এর চেয়ে আরেকটু শক্ত ও মজবুত ফাঁদ দরকার। তখন আল্লাহ তায়ালা "নারীগণ শয়তানের ফাঁদ": যাদের সৌন্দর্য দেখে পুরুষদের ধৈর্য ও স্থিতিশীলতার কাঁচের হৃদয়ে পাথর পতিত হয়, তিনি (আল্লাহ) তাকে উহা অর্পন করেন। তখন এই অভিশপ্ত অত্যন্ত খুশি হয়ে তুড়ি বাজাতে লাগল এবং নাচতে নাচতে উক্ত ফাঁদকে তুলে নিল। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নারীদের চেহারায় স্বীয় খাস তজল্লি [বিশেষ দীপ্তি] প্রদান করেছেন। কেননা, খাস অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের সাহসের চরণ তাঁর (আল্লাহ) খাস দর্শনের পরিমণ্ডলে পিছলিয়ে যাবে। প্রিয় বন্ধুগণ! প্রসিদ্ধ একটি উদাহরণ আছে যে, প্রত্যেক পূর্ণবস্তু পতনশীল। নিম্মোক্ত দলীল অনুযায়ী- "প্রত্যেক বস্তু স্বীয় মূলের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল"। যখন প্রত্যেক বস্তুর মূল হল অস্তিত্বহীনতা ও প্রকৃত বিদ্যমানহীনতা। অবশ্যই সেই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। চিন্তার বিষয় যে, হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য ও শোভা অবলোকন করে; যেটা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সত্তা দর্শনকারির সৌন্দর্য ও শোভার দর্পন এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার সৌন্দর্য্যের তজল্লীর বিকিরণ ছিল। সেই কারণে আল্লাহ্র দরবারের উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের মর্যাদাবান ফেরেশতাগণ তাঁকে (আদম আলাইহিস্সালাম) সিজদা করলেন। ইহা মনে কর না যে, তিনিই একমাত্র আদম যিনি ফেরেশতা কর্তৃক সিজদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নয়! নয়! বরং আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর মত কত লাখ আদম (আলাইহিস্সালাম) সিজদাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ইহার কোন কুল কিনারা নাই। আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

আদমের (আলাইহিস্সালাম) মত শত শত আদমকে (আলাইহিস্সালাম)
ফেরেশতা কর্তৃক সিজদা প্রদান করা হয়েছিল,

আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর মত শত শত আদম (আলাইহিস্সালাম) বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

যখন আদম (আলাইহিস্সালাম) কে অত্যন্ত সম্মান ও অশেষ মর্যাদা দ্বারা বেহেশতের মধ্যে সম্মান ও ইজ্জতের সিংহাসন আলোকিত করালেন। জান্নাত সমূহের বাগান বলল, অভিশপ্ত অসৎ হিংসুটে ধমনী নেচে উঠল এবং বার বার আদমের শানকে পদচ্যুতি ঘটানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত তানযীহ স্তর থেকে মতলব (উদ্দেশ্য) অর্জিত হয়, ততক্ষণ তাশবীহ স্তরের দিকে যাবে না।

কেননা আল্লাহ তায়ালার দর্শনের চারটি স্তরে রয়েছে। প্রথম স্তর হল- কুরবে নওয়াফেল (নফল ইবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন)। সত্য অনুসন্ধানী যখন সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য লাভ করেন, তখন তার শারীরিক ও আত্মিক শক্তির উপর সাধারণভাবে তৌহিদ যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাবল্য লাভ করে। আর তার অন্তর, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে যা রয়েছে প্রকৃত সত্ত্বার দর্শন হয়ে যাবে এবং তার থেকে অস্থায়ী গুণাবলী চলে যেতে থাকে। আর সে প্রকৃত আবশ্যক বিদ্যমান সত্ত্বার রঙ্গে রঙিন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও উপলব্ধি সবকিছু তাঁর [আল্লাহ] দিকে সম্বন্ধ হয়ে যায়।আল্লাহ তায়ালা তার কর্মের ও উপলব্ধির উপকরণ হয়ে যান। যদি আল্লাহ তায়ালা কর্তা এবং আল্লাহ অনুসন্ধানী উপকরণ হয়, তাহলে এই অবস্থায় ইহাকে কুরবে ফরায়েজ বলা হয়। আর যা উক্ত দু'টি স্তরের সমাবেশকারী হয়, উহাকে জময়ুল জমআ' স্তর বলা হয়। আর ইহা 'কা'বা কাউসাইনে'র (দুই ধনুকের ব্যবধান) মর্যাদাপূর্ণ স্তর। যদি দৃঢ়তা সুউচ্চ হয় এবং বন্ধুত্বের তৌফিক হয়। আর জমআ' (সমাবেশ) স্তরেও সীমাবদ্ধ না থেকে তারও উপরের স্তরে উন্নতি লাভ করে। তখন উক্ত স্তরকে আহদিয়তের (একত্ব) সমাবেশ স্তর বলা হয়। ইহা নিচ স্তর। আর খাস স্তর হল হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর। উম্মতের আউলিয়াগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত স্তরের অংশীদার হন। মূলকথা হল: যতক্ষণ খোদা অনুসন্ধানীর অন্তর চক্ষু আল্লাহ্র দর্শনের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হবে না, তার সায়রে তাশবীহ (সদৃশ ভ্রমণ) ও সৌন্দর্য্য দর্শনের দর্পন বিপর্যস্ত থাকবে। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছবেনা সায়রে তাশবীহ (সাদৃশ্যমান পথচলা) তার জন্য সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

মসনবী

রাজকীয় হেরেমের (অন্দরমহল) নকশা সুন্দর,
আল্লাহ্র নুর দর্শনের দর্পন সুন্দর।

পানি ও কাঁদার অভ্যন্তরে সৌন্দর্য লুকায়িত,
হৃদয়ে খোদার সাথে কৃত প্রাচীন প্রতিশ্রুতি (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?)
সতেজ কর।
প্রত্যেক চোখের কিবলা এই দর্পনে (মাটির মানব) রয়েছে,
চাক্ষুষ্মানদের দৃষ্টিস্থল এই দর্পন।
এই দর্পনের দীপ্তিকে নুর হিসেবে গ্রহণ কর,
দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টি থেকে তা দূরে রাখ।
অন্ধ কি জানে আয়নার মধ্যে কি আছে,
নিজের চেহারা আয়নাতে দেখ, কে তুমি বুঝতে পারবে।
যদিও ইহা খোদা দর্শনের দর্পন,
কিন্তু অন্ধ হৃদয়ের জন্য ইহা অন্ধকারাচ্ছন্নতা।
গাউছে মাইজভাণ্ডার হলেন খোদার নুর,
দোষত্রুটি থেকে তিনি পরিপূর্ণ মুক্ত।
কিন্তু মকবুলের (গ্রন্থকার) চোখে ইহা সত্য,
নতুবা, এই ব্যপারে অনেকের হৃদয়ে রয়েছে সন্দেহ।

ইশক বা প্রেমের প্রাথমিক স্তর হল ক্রন্দন ও আর্তচিৎকারের স্তর। এই স্তরে ব্যক্তির দৃষ্টি নিজের সত্তার প্রতিই থাকে। সেই সময় যা কিছু সে করে, নিজের জন্যই করে। এই অবস্থায় যদি মাশুককে (প্রেমাস্পদ) কর্ম অনুযায়ী অন্তরের অনুগত পেয়ে থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী হয়। নতুবা উক্ত সাধনায় দুশ্চিন্তা অর্জিত হয়। ইহাকে ইশক বলা হয় না। ইহা নিছক একটি স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। আশেকদের নিকট সে হিজড়া। হযরত নেজামী গঞ্জুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

কোন কোন ইশক (প্রেম) স্থায়ী নয়,
যেমন কামভাবের খেলনার সামগ্রী হল যৌবনকাল।
ইশক উহাকে বলে যেটা হ্রাস পায় না,
যাতে সে (আশেক) ইহা হতে পদক্ষেপকে না ফিরায়।
এইরূপ ইশক সাধারণ কোন কল্পনা নয়,
ইশকের আহল নয় এমন ব্যক্তি ইহা থেকে চিরতরে বঞ্চিত।

সত্য প্রেমিক এবং খোদা তালাশকারীর কাছে উক্ত স্তরে কখনও প্রেমাস্পদ চিন্তা থেকে আড়াল হন না। বরং নিজের চেহারাকে বন্ধুর চোখের প্রান্তের সামনে দিন রাত ঘর্ষণ করতে থাকে। আর যা কিছু করে নিজের বন্ধুর খাতিরে করে। নিজের প্রাণকে উৎসর্গ এবং প্রাণসমূহের প্রাণের কাছে ফানা (বিনাশ)

করে দেয়। যেই সময় ইশক (প্রেম) পূর্ণতা স্তরে পৌঁছে। আশেকের (প্রেমিক) নজর (দৃষ্টি) মাশুক (প্রেমাস্পদ) থেকে সরে ইশক স্থলে স্থির হয়। আর ইশককেই নিজের কিবলার জায়গা বানিয়ে নেয়। উক্ত স্তরে ইশক মাশুকের সাথে ও ইশক ইশকের সাথে পরিবর্তিত হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ! এই সবগুলো তর্কাতর্কি ও কথাবার্তা মাত্র। ইশকের পথে কথাবার্তার কি অবকাশ আছে? এই স্থানে হালেরই (ভাব-বিভোর অবস্থা) দরকার। ইশকের গুণাগুণ বর্ণনায় মুখের ভাষা বোবা (ভাষাহীন)। এই অধম (গ্রন্থকার) এর কাছে উক্ত আলোচনায় ঐ সমস্ত হযরতগণের ইশকের নিদর্শনাদির সাথে এক ধরণের সাদৃশ্য দেখানোই উদ্দেশ্য। নতুবা ইশক ও আশেকদের স্থানের সীমা থেকে এই অধম (গ্রন্থাকার) হাজার হাজার মাইল দূরে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য। হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় মোনাজাতে বলতেন, হে খোদা! তোমার কর্মের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমাকে এই লোকদের কাছ থেকে অথবা এই লোকদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, আমি অন্য কোন শপথ নেওয়ার শক্তি রাখি না।

কবিতা

যদিও আমি আমার ভাগ্য সম্পর্কে জানি না,
কিন্তু পূণ্যবান লোকদের সাথে আমি বন্ধুত্ব রাখি।

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, সে উক্ত সম্প্রদায়ে গণ্য হয়। সৃষ্টির সেরা আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর আল্লাহর দরুদ বর্ষিত হোক, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ, তাঁর উম্মতদের সমস্ত আউলিয়াগণের উপর কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! যেইভাবে তুমি চাও ও পছন্দ কর। হে জগত সমূহের প্রতিপালক, আপনি কবুল করুন।

তৃতীয় ফরতু: ইশক সংশ্লিষ্ট কতেক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গ

প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার প্রথম তজল্লীতে (দীপ্তি) মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সৌন্দর্য্য দর্শনের আয়নার মাধ্যমে ইশক (প্রেম) ও মহব্বত (ভালবাসা) এর পাশা খেলা ছিল। তিনি (আল্লাহ) মাশুকিয়ত (প্রেমাস্পদতা) ও আশেকিয়তকে (প্রেমময়তা) পরস্পর সুবিন্যস্ত করেন। যেই সময় হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর বরকতময় অস্তিত্বকে আলমে নাছুত (দৃশ্যমান জগত) এর জন্য উজ্জ্বল প্রদীপ বানালেন এবং ফুল বাগান সমূহের জন্য প্রজ্বলিত সৌন্দর্য্য মনোনীত করেন। আর বর্ণহীন অতুলনীয় বৈশিষ্ট থেকে বর্ণনময় তুলনীয় বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হলেন এবং প্রকাশ্য পদস্খলনের কারণে স্বীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরে গেলেন ও বঞ্চিত হয়ে গেলেন। আর অশেষ ভুলতা, সর্বোচ্চ গোপনীয়তার কারণে বঞ্চনার অতল গহবরে পতিত হলেন। খোদার সাথে প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং পূর্বের মহব্বত ও ইশকের কথা ভুলে গেলেন। আর উক্ত পারস্পরিক ইশক ও মহব্বতকে ভুলে গেলেন। কারণ ভুলে যাওয়া মানুষের অবস্থার সাথে সংযুক্ত। সেই কারণে ইনসানকে (মানুষ) ইনসান বলা হয়। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত প্রাচীন প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্বীয় কুদরতী হাতে আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর ডান পাশের পৃষ্টদেশকে স্পর্শ করেন। দলে দলে শুভ্র রংয়ের বংশধরগণ তাঁর (আদম আলাইহিস্সালাম) পৃষ্ঠ মোবারক থেকে বের হলেন। অনুরূপভাবে, তিনি (আল্লাহ) বাম পাশের পৃষ্ঠদেশকে মাসেহ করেন, ঝাঁকে ঝাঁকে কালো বর্ণের বংশধরগণ সৃষ্টি হল। তাদেরকে চারটি কাতারে (সারি) বিভক্ত করা হল। প্রথম সারিতে ছিলেন নবীগণ (আলাইহিস্সালাম), দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম), তৃতীয় সারিতে ছিলেন সাধারণ মুমীনগণ এবং চতুর্থ সারিতে কাফিরগণ ছিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" আর আমি তোমাদেরকে কি অস্তিত্বহীনতার মোড়ক থেকে অস্তিত্বের বলয়ে নিয়ে আসিনি?" আর সাবেক ইশক ও মহব্বতের প্রচীন অঙ্গিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুণরায় সতেজ অঙ্গিকার তাদের থেকে গ্রহণ করেন। তারা সকলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ'। আপনিই আমাদের মালিক ও প্রভূ। একইভাবে উক্ত অঙ্গিকারকে তিনবার পুণরোক্ত করে হাসন (সৌন্দর্য) ও ইশক (প্রেম) এর রীতির চাহিদা অনুযায়ী উক্ত অনাদি ইশক ও মুহব্বতকে মজবুত ও সুদৃঢ় করেন।

হাদিস সমূহ দ্বারা চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয় যে, প্রথমবার সবাই 'হ্যাঁ' বলে উত্তর দিল এবং স্বীকার করল। সেই কারণে জন্ম লাভ করার সময় সকল মানুষ মুসলমান হয়ে জন্ম লাভ করে। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি

ইসলামের ফিতরাত (প্রকৃতি) এর উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক বানিয়ে ফেলে"। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার কেউ কেউ স্বীকার করল এবং কেউ কেউ অস্বীকার করল। যারা সেই আলাস্তু'র ('আমি কি তোমাদের প্রভু নই?') শরাব দ্বারা সিক্ত হলেন, তারা বর্তমান দুনিয়াতে উক্ত শরাবে মাতাল হয়ে ফিরে। আর সর্বদা বন্ধুর অনুসন্ধানে জংগল ও মরুভূমি সমূহকে অতিক্রম করে। আর আউলিয়া কেরামদের খেদমতের মাধ্যমে আশির্বাদপুষ্ঠ হয়। জান-প্রাণ দিয়ে ইহার (খেদমত) আকাংখী হয় এবং উক্ত বুজুর্গদের পায়ের ধুলি হয়ে যায়। আর উক্ত দিনে যারা আলাস্তু'র শরাব থেকে বঞ্চিত থাকল। তারা এই পৃথিবীতে দুনিয়ার কুকুর পরিণত হল এবং দুনিয়ার লালসায় মত্ত হল। আর উক্ত অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকল। আউলিয়া কেরামদের ফয়জের নেয়ামত থেকে অংশীদারহীন রয়ে গেল। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

অতীতে যে তাঁর আলাস্তু (আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, হ্যাঁ) এর পেয়ালা থেকে খেয়েছে,
সে এই পৃথিবীতেও ইশকের ব্যাথা, দুঃখ ও মাতালতা ভোগ করে।
যখন সে কুকুরের মত স্বভাগতভাবে কুকুর শালায় বাস করে,
কিভাবে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্খা থাকবে?
কেবল যে পাপ করেছে সে অনুশোচনা করে
যে সঠিক পথ হারিয়েছে সে হায়! হায়! করে কাঁদে।

বিশ্বজগতের খোদা প্রতিশ্রুতি দিবসে আলাস্তু (আমি কি তোমাদের রব নই?) শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে সবাইকে সুশোভিত করেন। আর আত্মা সমূহ উক্ত শব্দকে সুমিষ্ট স্বরে শ্রবণ করেছিল। তাই, হযরত রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আমি রহমানের পক্ষ থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার সময়ে রহমানের আওয়াজ ইয়ামেনী সূরে শুনেছিলাম'। মাহবুবে ইলাহী হযরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, "আমি আলাস্তু শব্দটি পূর্বাঞ্চলীয় সূর বৈচিত্রে শ্রবণ করেছি। আমার কর্ণদ্বয় এখনো পর্যন্ত উক্ত আওয়াজটি দ্বারা ভরে আছে। যেন উক্ত দিনের এখনো পর্যন্ত রাত আসেনি।" অনুরূপভাবে প্রতিটি আত্মা স্তর অনুযায়ী উক্ত আওয়াজটি শুনেছিল। তাই, উক্ত আওয়াজটি এখনো জারি আছে। আর শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কান উহা শ্রবণ করে। উক্ত আওয়াজকে আলাস্তু ধ্বনি, আনহদ ধ্বনি, চিরস্থায়ী ধ্বনি ও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ধ্বনি বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা উক্ত দিবসে উক্ত আলাস্তু সম্বোধনটি যে সূর ভঙ্গিতে শুনেছিল,

যখন দুনিয়াতে উক্ত সূর ভঙ্গি শুনে তখন তার উপর তন্ময়তা ও ভাব বিভোরতা সৃষ্টি হয়।

তাই, উহা 'মুকাদ্দামাতে যুহুরি' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। আওয়াজ (ধ্বনি) তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার হল এই যে, পরস্পর দুইটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ায় একপ্রকার আওয়াজ (ধ্বনি) সৃষ্টি হয়। যেমন দুইটি হাতের নড়াচড়ায় একপ্রকার আওয়াজ (ধ্বনি) বের হয়। আর একটি অঙ্গের নড়াচড়ায় কোন প্রকার শব্দ প্রকাশ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হল এই যে, নড়াচড়া ব্যতীত স্থুলদেহ এবং আগুন ও পানির মূল উপাদানের সংশ্লেষণ ছাড়া যে ধ্বনি প্রকাশ হয় উহাকে বসীত (একক) ও লতিফ(সূক্ষ্ম) ধ্বনি বলা হয়। তৃতীয়টি হল- আনহদ ধ্বনি; যেটি কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া সর্বদা একই অবস্থায় প্রকাশিত হয়। উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয় না। গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফে এসেছে যে, হযরত সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওত প্রকাশের পূর্বে ও পরে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাই, হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওত প্রকাশের পূর্বে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে হেরা গুহায় গমন করতেন এবং আনহদ ধ্বনিতে রত হতেন। যার বরকতে জিবরাঈল (আলাইহিস্সালাম) এঁর আকৃতি তাঁর কাছে প্রকাশিত হল এবং অহি নাযিল হতে লাগল। জনাব সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নিকট অহি অবতরণ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি কখনও ডেকচির স্ফুটনের ধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি এবং কখনও মৌচাকের মৌমাছির শব্দের অনুরূপ ধ্বনি শুনে থাকি। আবার কখনও ফেরেশতা মানব আকৃতিতে আগমন করে আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। আর মাঝে মাঝে আমি ঘন্টা ধ্বনির মত একটি আওয়াজে শুনি। যেমন হযরত খাজা হাফেজ বুলবুল সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ইঙ্গিত করেন-

পংক্তি

কেউ জানে না যে, প্রেমাস্পদের মঞ্জিল কোথায়,
এতটুকুই যে, ঘন্টা ধ্বনি (আলাস্তুর ধ্বনি) আসে।

হযরত গাউছে সাকলাইন আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছয় বছর হেরা গুহায় সুলতানে আজকার (যিকির সমূহের সুলতান) এর ধ্যানে; যেটি উক্ত ধ্বনি (আলাস্তু ধ্বনি) থেকে উৎসারিত হয়, তাতে মগ্ন ছিলেন। আর আমি উক্ত হেরা গুহায় বার বছর পর্যন্ত ধ্যান করতে থাকলাম। যা

কিছু উপকারিতা ও প্রশস্ততা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উক্ত কর্ম থেকে অর্জিত হয়েছে তা বর্ণনাতীত।"

তাই, উহাকে হযরত গাউছে গাওয়ালিয়ারি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'জাওয়াহেরে খামসা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আলাস্তু' ধ্বনি সমস্ত ধ্বনি সমূহের "মূল"। প্রতিশ্রুতি দিবসে প্রত্যেক প্রাণী বরং প্রত্যেক কাঠ, পাথর, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থসমূহও উক্ত ধ্বনির স্বাদ আস্বাদন করেন। 'আলাস্তু' ধ্বনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন মাধ্যম ব্যতিত প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ সমূহে এখন পর্যন্ত জারি আছে। আরেফ রুমি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

এই ধ্বনি (আলাস্তুর ধ্বনি) প্রতিটি ধ্বনি ও কান্নার মূল উৎস,
প্রকৃতপক্ষে ইহাই একমাত্র ধ্বনি, বাকিগুলো কেবল প্রতিধ্বনি।
তুর্কি, কুর্দি ও ফার্সি ভাষী মানুষ এবং আরবগণ
ঐ ধ্বনিটি বুঝেছেন কর্ণ ও ঠোঁটের সাহায্য ছাড়া।
হ্যাঁ, তুর্কি, তাজিক জাতি ও ইথিওপিয়ান জাতি কি বুঝেছে?
এমনকি ঐ ধ্বনিটি কাঠ ও পাথরও বুঝেছে।

যদিও সমগ্র বিশ্ব উক্ত "আলাস্তু" ধ্বনি দ্বারা পূর্ণ। কিন্তু সচেতন অন্তর ও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতিত উক্ত ধ্বনির রহস্য হতে কোন প্রকার উপকারিতা ও স্বাদের ব্যাপারে সচেতন নয়। হযরত শায়খ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন–

পংক্তি

এই ধ্বনির (আলাস্তুর ধ্বনি) গায়ক কখনো চুপ থাকেন না,
কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ঐ ধ্বনি শুনা থেকে কানকে বিরত রাখবে না।
যখন এই রহস্য ছেমাকারীর নিকট উন্মুক্ত হয়;
তার ওজদ (প্রেম বিভোরতা) ও মাস্তি (মাতালতা) সৃষ্টি হয়।

হযরত মওলানা রুমি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন–

কবিতা

প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে আলাস্তু ধ্বনি আসে,
এতে পাথর (জড় পদার্থ) ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলো মাতাল হয়ে যায়।
যদি بلي (হাঁ) শব্দটি হৃদয় থেকে না আসে,
তবে অদৃশ্য জগত থেকে بلي (হাঁ) শব্দটি আসতে থাকবে।

এই রহস্য যখন 'উস্তুনে হান্নানা' (কান্নারত খেঁজুর গাছের খুঁটি) এঁর নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল, তখন সে হযরত সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বিরহে বিচ্ছেদে আর্তনাদ করেছিল।

পংক্তি

'উস্তুনে হান্নানা' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বিচ্ছেদে বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মত আর্তনাদ করতে লাগল ।

যখন এই রহস্য পাথর কণার নিকট খুলে গেল,

আবু জেহেলের হাত রাসূল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর রেসালতের স্বাক্ষ্য দিল।

মসনবী

আবু জেহেলের হাতে কিছু পাথর নুড়ি ছিল,

সে বলল, হে আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা কি তাড়াতাড়ি বলুন।

আপনি যদি রসুল হন, তাহলে বলুন, আমার মুষ্টিতে কি লুকানো আছে?

তবে আসমানের রহস্য সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দান করুন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি আমার কাছে কেমন করে জানতে চাও?

আমি কি সে হাতের মুষ্টিতে লুকানো জিনিস গুলো সম্পর্কে তোমাকে বলব,

নাকি তারা (পাথরগুলো) বলবে যে, আমি সত্যবাদী এবং সঠিক?

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা আছে,

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার হাতে ছয় টুকরো পাথর কণা আছে।

আবু জেহেল বলল, এই দ্বিতীয় বিষয়টি আরও অসাধারণ,

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি প্রতিটি পাথর কণা থেকে সত্যের তাসবীহ (আল্লাহর একত্ববাদের স্বাক্ষ্য) শুন।

তৎক্ষণাৎ তার বন্ধ মুষ্টির মাঝখান থেকে প্রতিটি নুড়ি কলমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করতে থাকে।

প্রতিটি নুড়ি বলে, লা-ইলাহা (কোন ইলাহ নেই) প্রতিটি নুড়ি বলে,

ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতিত)- আর আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসুল।

যখন আবু জেহেল নুড়ি পাথরের কাছ থেকে একথা শুনল,

তখন সে ক্রোধে নুড়িগুলো মাটিতে ফেলে দিল।

সে বলল, আপনার মত যাদুকর আর কেউ নেই

আপনি যাদুকরদের অন্যতম ও মাথার মুকুট।

যদিও উদাসীনতার পর্দা এবং জল ও মাটির স্থূলতা উক্ত ধ্বনি শুনা থেকে এবং উক্ত রহস্য জানা থেকে বাঁধা প্রদান কারী হয়। যেহেতু 'আলাস্তু' ধ্বনি অন্য ধ্বনি সমূহের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে, যখন ছেমার অবস্থায় উক্ত ধ্বনির তাসির (প্রভাব) আশেকদের অন্তরে প্রভাবিত করে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা অজ্‌দ (প্রেম বিভোর অবস্থা) ও নৃত্য করতে থাকে। যাইহোক, পানি প্রশ্রাবের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে খারাপ স্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, উহা আগুনকে স্বাভাবিকভাবে নিভিয়ে ফেলে। আর পানি ও মাটির প্রভাবে কাওয়ালদের (গান পরিবেশনকারী) সূর গুরুগম্ভীর ও নিম্ন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত 'আলাস্তু' ধ্বনি বেহেশতের সুস্বাদু ঝর্ণা সমূহের জন্য বেদনার আগুন ও আশেকদের বিচ্ছেদের মিলন আকাঙ্খাকে স্বীয় প্রকৃতি দ্বারা নিভিয়ে ফেলে। আর 'ছেমা' দ্বারা আশেকদের জন্য 'আলাস্তু' সূর ধ্বনির মিলনের আকাঙ্খা বেড়ে যায়। আরেফ রুমি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন–

মসনবী

আমরা সবাই আদমের (আলাইহিস্‌সালাম) অংশ,
আমরা জান্নাতে সেই সুর শুনেছি।
যদিও আমাদের দেহের উপাদান পানি ও মাটি আমাদের সন্দেহের উদ্রেক করেছে,
তবে সেগুলোর কিছু সুর আমাদের স্মৃতিতে ফিরে আসে।
কিন্তু যেহেতু এটা (আলাস্তু সুর) দুঃখের মাটির সাথে মিশে আছে,
কিভাবে এই উচ্চ ও অনুচ্চ স্বর আমাদের একই আনন্দ দেবে?
যখন পানি প্রস্রাবের সাথে মিশে যায়,
তখন তার স্বাদ তিক্ত ও অম্ল হয়ে যায়।
মানুষের শরীরে অল্প পরিমাণ জল আছে,
মনে কর এটা প্রস্রাব, তবুও এটি আগুন নিভিয়ে দেবে।
যদি জল অপবিত্র হয়ে থাকে, তবুও এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়,
কারণ এটি তার স্বভাব দ্বারা দুঃখের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।
তাই সামা (সূফি সংগীত) খোদা প্রেমিকদের খাদ্য,
যেহেতু এর মধ্যে রয়েছে মনের প্রশান্তি।
শ্রবণ শব্দ থেকে মানসিক কল্পনাগুলো একটি শক্তি সংগ্রহ করে,
বরং সেগুলো ধ্বনি ও শিস রূপ ধারণ করে।

দার্শনিকদের কাছে গানের রাগ, তাল, সূর ও গানের ব্যপারে প্রাথমিক পর্যায়ে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা ছিল আক্ষরিক অর্থে। এমনকি ইহা (গান, সূর, রাগ) প্রাচীন ও নব আবিষ্কৃত বিষয় হওয়ার ব্যপারেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাই 'মিরাতুল খেয়াল' প্রণেতা লিখেন যে, একদল ইহাকে

(আলাস্তু ধ্বনি) যোহরা তারকার আওয়াজ হতে উৎসারিত বলে থাকে এবং অনাদি ও চিরস্থায়ী বলে থাকেন। আর সঙ্গীতজ্ঞগণ উহাকে রহস্যের রহস্য অর্থাৎ খোদার সংগীত বলে থাকেন। কতেক দার্শনিক বলেন যে, ইহা পারস্পরিক সম্ভাব্য কামনা বাসনার রূপ গ্রহনকারী। এই দলের লোকেরা সংগীত বা গানকে নবসৃষ্ট বলে থাকেন। এই দলের নিকট মুসিকি (সংগীত) সুরিয়ানি (প্রাচীন সিরিয়ার ভাষা) ভাষার শব্দ। مو (মূ) অর্থ- কামনা বাসনা এবং سيقي(সিকি) অর্থ- গ্রন্থি, গিরা। যেন সঙ্গীতজ্ঞগণ জটিল কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত। কেননা, গান গাওয়ার অর্থ হল কামনা বাসনাকে আবদ্ধ করে ফেলা। আবুল ইয়ামিন আব্দুর রাজ্জাক হোসাইনী সুরতি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'মুকাদ্দামাতে যুহুরী' গ্রন্থে লিখেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন, হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা এই পাথরে আঘাত কর। হযরত মূসা (আঃ) লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন। এতে সেখানে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল এবং সেখান থেকে আওয়াজ বের হতে লাগল। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - "আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপর। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ।" (সূরা বাক্বারা: ৬০)। তখন মুসা (আঃ) এঁর কাছে আহবান এল যে, হে মূসা! উক্ত ধ্বনিগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখ। সেই জন্য উক্ত জ্ঞানকে সংগীতের জ্ঞান বলা হয়। কেননা, এই জ্ঞানেরও বারটি স্তর রয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি 'তাফসীরে কবীর' এ বলেন যে, সংগীতের জ্ঞানের সূচনা হয় হযরত সোলায়মান (আঃ) এঁর শিষ্য দার্শনিক পিথাগোরাস থেকে। তাই 'হাদিকায়ে আনওয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উক্ত দার্শনিক (পিথাগোরাস) কে কেউ স্বপ্নের মধ্যে শুভ সংবাদ দিল যে, আগামীকাল ভোর বেলা সমুদ্রের তীরে তোমার জন্য একটি জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হবে। পিথাগোরাস ভোর বেলা সমুদ্রের তীরে হাঁটতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছেন। কী অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলেন যে, কামাররা লোহাকে আগুনের ভাট্টি থেকে বের করে কামারের নেহাই এর উপর রেখে হাতুড়ি দ্বারা পিঠাতে লাগল। এতে প্রত্যেক দিক থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজ বের হতে লাগল। উক্ত দার্শনিক (পিথাগোরাস) উক্ত স্থানে মুরাকাবায় বসলেন। আর হাতুড়ির আঘাতের আওয়াজ থেকে গানের আওয়াজকে সাব্যস্ত করে উপদেশ পূর্ণ একটি কবিতা রচনা করেন। বনি ইসরাঈলের সমাবেশে উহাকে চিত্তাকর্ষক সূরে পরিবেশন করেন। এতে অধিকাংশ শ্রোতাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। আর অন্য একটি দল এতে ভাব বিভোর ও তন্ময় হয়ে গেল। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যন্য দার্শনিকগণ গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করে উপলব্ধি করলেন

যে, যখন আলোক দানকারী সূর্য প্রতিটি কক্ষ পথ দিয়ে বারটি কক্ষ পথসমূহে পরিভ্রমণ করে, তখন প্রত্যেক কক্ষপথ থেকে একটি স্বতন্ত্র আওয়াজ বের হয়। সেই কারণে, বারটি কক্ষপথ অনুযায়ী সংগীতেরও বারটি স্তর রয়েছে। যা নিম্নোক্ত রুবায়ীতে(চতুষ্পদী কবিতা) উল্লেখিত হয়েছে। উহাকে ধারণ কর-

চতুষ্পদী কবিতা

সত্য প্রেমিক বুসালিককে (সঙ্গীতের স্তরসমূহের মধ্যে ৭ম স্তর) বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিবেশন করে,
এতে ইস্ফাহানের ভদ্র মহিলাগণ মোহিত হয়ে যায়।
[এই শেয়ারে সঙ্গীতের স্তর সমূহ হল রাস্ত, উশ্‌শাক, বুসালিক, নাভা,
ইস্ফাহান, বুজুর্গ]।
এই শেয়ারে সঙ্গীতের স্তর সমূহ হল,
জিরআফগন, ইরাক, জাঙ্গোলাহ, হোসাইনি, রাহাভি ও হিজায।

সংগীতে ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিনীর উৎপত্তি হয়। যখন উক্ত রাগ-রাগিনী গান পরিবেশনের সময়ে গানের সুর উচ্চ মাত্রায় উপনীত হয়, তখন উহার প্রভাব শ্রোতাদের হৃদয়সমূহে পতিত হয়। তাই হযরত রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন -

মসনবী

তাই দার্শনিকরা বলেছেন, এই সুরগুলো আমরা আকাশের আবর্তন থেকে পেয়েছি। এই সুরগুলো যেগুলো লোকেরা ড্রাম ও গলার মাধ্যমে গায়, সেগুলো আকাশের আবর্তনের শব্দ।

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত মতভেদসমূহ আক্ষরিক অর্থে। মূলতঃ আওয়াজ সমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেই কারণে উহাকে হাকিকতপন্থীগণ খোদায়ী আওয়াজ ও স্বতন্ত্র আওয়াজ বলে থাকেন। আর দার্শনিকগণ, ইহাকে রহস্যের রহস্য বলে থাকেন। আর বাকি যতগুলো আওয়াজ পৃথিবীতে রয়েছে, চাই উহা আকাশের আওয়াজ অথবা শিশুর আওয়াজ হোক। উক্ত আওয়াজ হাকিকি, খোদায়ী ও অনাদি আওয়াজ। কেননা, পরগাম্বরগণ বিধানগতভাবে সংগীতকে বিন্যস্ত করেছেন। তাই হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

এই ধ্বনি প্রতিটি কান্না ও ধ্বনির উৎস,
এটি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ধ্বনি এবং বাকিগুলো প্রতিধ্বনি।

মূলতঃ দিলওয়ালাদের (আউলিয়া) ছেমা খোদা তায়ালার আলাস্ত'র ধ্বনির আস্বাদনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই কবি বলেন-

পংক্তি

কিন্তু বেহালার শব্দে তার শ্রবণ উদ্দেশ্য ছিল,
যেরূপ খোদার উৎসাহী প্রেমিক তার মনের মধ্যে ঐশ্বরিক সেই সম্বোধন কল্পনা করে।
সানাইয়ের আর্তনাদ ও তবলার তীব্র আওয়াজ
নিঃসন্দেহে এগুলো অনাদির আদেশ অনুসারে চলমান।

গোপন থাকে না যে, যিকর (স্মরণ) এর মূল হাকিক্বত হল উদাসীনতা দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে, ছেমা অবস্থায় ছেমা শ্রবণকারীর নিকট যতটুকু তৎপরতা ও স্থীরতা সৃষ্টি হয়, যেন তার প্রতিটি লোমকূপ থেকে সুলতানুল যিকর (শ্রেষ্ঠ যিকির) জারি আছে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ছেমা অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে নৃত্য করে অথবা আহাজারি করে অথবা উচ্চস্বরে চিৎকার করে; এই সবগুলোই আল্লাহ তায়ালার যিকর হিসেবে গণ্য। যারা পৃথিবীতে ছেমার স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত, তারা প্রকৃত পক্ষে 'আলাস্তু' ধ্বনির স্বাদ উপভোগ এবং বেহেশতের আওয়াজের স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত। যে ছেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আল্লাহ্‌র যিকিরের নেয়ামত থেকে দূরে সরে গেল। দুনিয়াদার আলেমগণ, ঐ 'আলাস্তু'র নেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং 'আলাস্তু'র অনাদি আহবান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত।" (সূরা ইয়াসীনঃ ২৬)। দুনিয়াকে পরকালের উপর এবং পুলসিরাত পারাপারকে বেহেশত প্রবেশের জন্য; যাকে দোযখের পৃষ্ঠদেশ টেনে রেখেছে এই জন্য অগ্রগামী করা হয়েছে, যাতে ইহা দ্বারা 'আলাস্তু'র মর্যাদা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা যায়।

পংক্তি

ফলে পার্থিব জীবন প্রথমে এসেছে,
যাতে তোমরা আলাস্তুর সাম্রাজ্যকে মূল্যায়ন করতে পার।

রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে শরাব রয়েছে যা তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যখন তাঁরা তা পান করে তখন তাঁরা নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় তখন তাঁরা আনন্দিত হয়ে যায়। আর যখন তাঁরা আনন্দিত হয় তখন মিলন স্বাদ লাভ করে"। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে শরাব রয়েছে যা তাঁর বন্ধুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যখন তাঁরা তা পান করে তখন তারা শরাবে মাতাল হয়ে যায়, তখন তাঁরা আনন্দিত ও উচ্চসিত হয়। আর যখন উচ্চসিত হয় তখন মিলনের স্বাদ লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-"নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র। এটা একটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা একে প্রবাহিত করবে।"(সূরা আদ্-দাহরঃ ৫-৬)।

কবিতা

এই শরাব যেটি তুমি খাও তা হারাম,
আমরা শরাব খাব না ইহা হালাল করা ব্যতিত।
খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাও তাহলে অস্তিতহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করবে,
এবং খোদার ইশকের শরাবে মাতাল হবে।
ইশকের শরাব কখনও ওযুবিহীন পান করো না,
দেহের মধ্যে আমার আত্মাটি কোন পুত আত্মা।

হে প্রিয় বন্ধু! 'আলাস্তু' ধ্বনির আনন্দদায়ক সূর প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রতিমুহূর্তে তোমার দেহ- প্রাণের সারঙ্গী ও সেতার বাদ্যযন্ত্রে বিদ্যমান। বরং সমগ্র বিশ্ব জগতের ঢোল ও বাদ্যযন্ত্রে খোদায়ী 'আলাস্তু' ধ্বনির গানের সুউচ্চ শব্দ গীত হচ্ছে।

কবিতা

যখন বন্ধু আসবে, তখন আমার হৃদয়কে করে দিব কাবাব,
মস্তককে বানাব সুরাহী (পান পাত্র) এবং রক্তকে বানাব ইশকের শরাব।
দেহকে সারঙ্গী বানিয়ে রগকে করব ইহার তার,
উক্ত সারঙ্গীর প্রতিটি ঘটে ঘটে বন্ধুর নাম বাজাব।

অতএব, গায়ক বা গান পরিবেশনকারী একজন। প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিবর্গ উহার ধ্বনি দ্বারা দৈহিক শরাব পান করে এবং আরেফগণ(খোদা পরিচিত জ্ঞানী) ও আশেকগন আল্লাহ্‌র ইশকের শরাব পান করে। অতএব, উহা তাদের (প্রবৃত্তির অনুসারীগণ) নফ্‌সের খাদ্য হিসেবে পরিগণিত এবং অপরপক্ষে, তাদের (আশেক) জন্য রুহানী খাদ্য হিসেবে পরিগণিত। প্রাণের গায়ক সর্বদা মাতাল বন্ধু। কারো কাছে গানকারী মুখ্য এবং কারো কাছে প্রবৃত্তির অংশে মনোযোগই মুখ্য। যদিও উভয়টি প্রকাশ্যে একই কাজে সামিল। কিন্তু, তম্মধ্যে একটি আলোকিত,অপরটি অন্ধকার। মানবীয় সত্তা কলসির মত। কোনটি আবে হায়াত (অমৃত) এবং কোনটি মৃত্যুর বিষে ভরপুর। অতএব, যার দৃষ্টি পাত্রে রক্ষিত বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ, সে ভাল মন্দের পারস্পরিক পার্থক্য দ্বারা সরল ও সঠিক রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে পাত্রকে দেখে, সে রাত্রিকালিন কাঠ তালাশকারীর মত। গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কূপে মাথার চুল ফেলে। অগ্নিপূজক ও মুমীন প্রত্যেকে পরস্পরে বাহ্যিকভাবে উহাতে শামিল।

কবিতাংশ

আমরা বাহ্যিকভাবে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখি।

কিন্তু একটি নুর ঈমান দ্বারা আলোকিত এবং অন্যটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কুফরি দ্বারা ও আভ্যন্তরীনভাবে দৃষ্টিহীন; সে শাব্দিক ও বাহ্যিক সমন্বয়ে ব্যস্ত ও সর্বদা

পথহারা। যার অন্তরচক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন, সে সচেতন ব্যক্তি। দেহের চক্ষু সর্বদা দেহের মাঝখানে থাকে। আর প্রাণের চক্ষু সর্বদা আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীন হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তু খোদায়ী দর্পনের অনুলিপি। ইহা হকপন্থীদের নিকট হক্কের বহির্দৃশ্য এবং ফাসেক বা পাপীদের নিকট ধূলাবালির মত অন্ধত্বের কারণ। কেননা আল্লাহ এরশাদ করেন-"এ দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেককে বিপদগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপদগামী করেন না। (বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা বাকারা: ২৬-২৭)। প্রকৃতপক্ষে ছেমা ও গান হৃদয়বানদের জন্য রহমানের পবিত্র শরাব। আর প্রবৃত্তির অনুসারী ও ফাসিকদের জন্য শয়তানী মদ। ঈমানদার ও আশেকদের অজ্‌দ (প্রেম বিভোর অবস্থা) ও আনন্দ-খুশি আল্লাহর বিচারালায়ে শাহাদাত প্রাপ্ত বা উৎসর্গীত। আশেক নর্তক প্রাচীন অঙ্গীকার 'আলাস্তু'কে সতেজকারী এবং আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি প্রদানকারী।

কবিতাংশ

অনাদি ও অনন্তের শরাব পরিবেশনকারী আমাদেরকে এক পেয়ালা শরাব দাও,
যাতে এই পৃথিবীতে ঐ পেয়ালার শরাবের স্বাদ দ্বারা আমাদের নিজেদেরকে
আন্দোলিত করি।
হে শরাব পরিবেশনকারী এই মাহফিলে (পৃথিবী) ইশকের শরাব পান করাও,
যেন আসমানী শব্দ এখন শুনতে পাই।
অনাদিকালে আমরা ছিলাম খুশিতে মাতোয়ারা,
কেননা সেখানে আলাস্তুর টুংঠাং শব্দ আমাদের সুরাহী (পানপাত্র) তুল্য কর্ণে
আমরা শুনেছিলাম।

যেরূপ লোহা ও পাথরের মধ্যে আগুন গোপন থাকে অথবা মাটির নীচে পানি লুকিয়ে থাকে, সেরূপ অন্তর সমূহের গোপন রহস্য এবং বাতেনী মূল্যবান বস্তু উহার (ছেমা) মধ্যে লুকায়িত। আর উক্ত (গোপন রহস্যাদি) বিষয়গুলোর প্রকাশের প্রচেষ্টা রাগ বা গান ব্যতীত উত্তম আর কিছু হতে পারে না। কান ছাড়া অন্তরে শব্দ প্রবেশের রাস্তা নেই। অন্তর অলংকারপূর্ণ ও উপভোগ্য গানের প্রতি প্রকৃতিগতভাবে অনুগত। এমনকি উহার ভাল মন্দ সব প্রকাশ করে দেয়। কেননা অন্তরের অবস্থা ভরা বর্তনের (পাত্র) মত। যখন উহাকে প্লাবিত করা হয়, তখন উহাই বের হয় যা তার মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে। কেননা বলা হয়ে থাকে, প্রত্যেক বর্তন (পাত্র) তার মধ্যে অবস্থিত বস্তু দ্বারা পূর্ণ। অনুরূপভাবে,

রাগ বা গানের সূরও অন্তর সমূহের জন্য সত্য বন্ধন। যখন উহা দ্বারা (গানের সূর) অন্তরের মধ্যে নড়াচড়া হয়, তখন উহা (অন্তর) থেকে ঐ কথায় প্রকাশিত হয়, যা উহার (অন্তর) উপর প্রাবল্য থাকে। আল্লাহ তায়ালার জন্য যে গুনমান অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হয়, উহাকে অজ্‌দ (প্রেম বিভোর অবস্থা) বলে। যদি ভাল নিয়তে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ব্যতিত অজ্‌দকারী ব্যক্তি নিজেকে কোন একটি পদ্বতিতে প্রকাশ করবে, উহাকে তাওয়াজুদ (تواجد) বলে। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন - "তোমরা আল্লাহর প্রেমে ক্রন্দন কর। যদি ক্রন্দন না আসে তখন ক্রন্দনকারীর অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি কর"। 'অজ্‌দ' এর স্তর সমূহের বিন্যাস হল - প্রথম স্তর 'কসুদ', পরের স্তর দরুদ, এর পরের স্তর শুহুদ, তারপরের স্তর অজুদ এবং সর্বশেষ স্তর খুদ। সেই যুগে কতেক প্রকাশ্য শরীয়তপন্থী সাধারণভাবে কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিত এবং কোনরূপ সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ ব্যতিত 'ছেমা'কে হারাম বলার ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করেন। উক্ত আলেমদের কাছে না হাদিসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ আছে এবং সাহাবীদের জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন খবর আছে? তারা জ্ঞানগর্ভ মুহাদ্দিসদের কথাকে খণ্ডন করে। আর ফিকহবিদদের প্রকাশ্য কথাকে না বুঝে অনুসরণ করে। তারা তাদের কথার উদ্দেশ্য বুঝার শক্তি রাখে না। তারা শর্তহীন ও শর্তযুক্ত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি রাখে না।

তারা সরল পথ থেকে সীমালংঘন করে। তারা খোদা ও রাসূলকে ভয় করে না। তারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলে ফেলে। তারা ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন - "হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন।" (সূরা মায়েদাঃ ৮৭)। তোমরা নিজেই সরল শরীয়তের রাস্তার সীমালংঘন করছ। শুধুমাত্র মুখে শরীয়ত শরীয়ত বলে চিৎকার করে মরতেছ। অমনযোগীগণ শুন এবং ন্যায় বিচার কর, তোমাদেরকে কোন বিভ্রান্ত ও নিরেট অজ্ঞ বিভ্রান্ত করেছে? তোমরা শরীয়তকে কোন বিষয়ের নাম হিসেবে গ্রহণ করেছ? উক্ত 'ছেমা' স্বয়ং রাসূল মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুনেছেন। সাহাবীগণ, তাবেয়ীনগণ ও তাবে তাবেয়ীনগণ শুনেছেন। ইমামগণ ও সম্মানিত আউলিয়াগণ শুনেছেন। এখন তোমরা ছেমা'র অস্বীকারকারী হয়ে গেছ এবং সাধারণভাবে হারাম বলে বসেছ। তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে ঐ কথার প্রবক্তা হওয়া যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীনগণ, তাবে-তাবেয়ীনগণ, আল্লাহওয়ালা আলেমগণ এবং সত্যবাদী আউলিয়াগণ হারাম কাজ করেছেন এবং হারাম কাজে রাজি হয়েছেন। আর যারা উক্ত কথাকে বিশেষ করে স্বীয় নবী ও রাসূলে খোদা

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করবে, সে নিশ্চিত কাফির হয়ে গেল। এখন বল, যখন রাসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শরীয়তে 'ছেমা' সিদ্ধ এবং সাধারাণভাবে হারাম নয়। তাহলে, তোমরা কোন শরীয়তের উপর আছ যাকে হারাম বলতেছ? হাঁ, তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণ বিভ্রান্ত করেছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-"আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি।" (সূরা বাকারা: ১৭০)। উহা (ছেমা) সিদ্ধ বা বৈধ হওয়ার প্রমাণ প্রথমে কুরআন থেকে নাও। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে" (সূরা রুম: ১৫)। ইমাম কুশাইরি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) "তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে।" আয়াতাংশ দ্বারা 'ছেমা' এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর 'আইনুল মা'আনি' প্রণেতা, 'হোসাইনী' গ্রন্থের প্রণেতা ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ উহার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

হাদিস শরীফে এসেছে যে, বেহেশতের মধ্যে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ নিম্নোক্ত কথাগুলো গাইবেন, "আমরা সর্বদা বেহেশতে অবস্থান করব। অতঃপর কখনো মৃত্যুবরণ করব না। আমরা কোমল শরীরের অধিকারীনী। অতঃপর কখনো পুরানো হব না"। ইমাম কুশাইরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত- "সে দিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে"(সূরা ইয়াসীন: ৫৫)- আয়াত থেকেও ছেমা উদ্দেশ্য করেছেন। ছেমা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদিসে ফে'লি (কর্মমূলক হাদিস) থেকে গ্রহণ কর। কেননা হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই এবং সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছেমা করেছেন এবং অজ্দও করেছেন। তাফসীরে আহমদীতে আছে- হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন একটি মজলিশে ছিলেন। হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম) অহী নিয়ে আগমন করে বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার দরিদ্র উম্মত ধনী উম্মতদের অর্ধদিন আগে; যার পরিমাণ পাঁচ শত বছর, বেহেশতে প্রবেশ করবে"। ইহা শুনেই হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত খুশি হয়ে ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি কবিতা পাঠকারী আছ"? একজন বেদুঈন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হ্যাঁ, আছি। এবং তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পড়তে লাগলেন,

কবিতা

আবেগের সর্প আমার কলিজা দংশন করেছে,
অতঃপর ইহার কোন চিকিৎসক ও ওঝাঁ নাই।
কিন্তু যে বন্ধুর প্রেমে আমি মুগ্ধ তাঁর কাছে আছে,
আমার মন্ত্র ও প্রতিষেধক।

তখন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অজ্‌দ করলেন এবং সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)ও তাঁর (দঃ) সাথে অজদ করলেন। এমনকি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁধ মোবারক থেকে চাদর পড়ে গেল। যখন তিনি অজ্‌দ থেকে অবসর হলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে স্থির হলেন, তখন মোয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাদের খেলা (অজদ) অনেক উত্তম"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, "বন্ধুর আলোচনা শুনার সময় যে নড়াচড়া করে না, সে করিম (উদার) নয়" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি বন্ধুর আলোচনা শুনার সময় নড়াচড়া করবে না, সে করিম (উদার) নয়।

উহার পর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর চাদর মোবারক চারশত টুকরায় বিভক্ত করে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। একদিন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইরশাদ করেন, "হে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)! তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে"। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত কথা শুনে আনন্দিত হয়ে এত পরিমাণ নৃত্য করলেন যে, তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে বেহুশ হয়ে গেলেন। অনুরূপভাবে, হযরত জাফর সাদেক তাইয়ার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে একদিন হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি আমার সাথে সাদৃশ্য রাখ"। তিনি ইহাতে খুশি হয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে নৃত্য করলেন। সাহাবায়ে কেরামদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাইয়ার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অনেক মক্কাবাসী সাহাবীগণ ছেমা চর্চা করতেন। ইহা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে। মসজিদে নববীতে যখন হাবশিরা (ছোট বাচ্চা) খেলা করত, তখন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়শাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাদর মোবারক দ্বারা আচ্ছাদিত করে কৌতুক দেখাতেন। কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি বেশি ঝোঁক থাকে। লক্ষ্য করা যায় যে, কতক্ষণ পর্যন্ত তিনি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দেখতেন, যাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই সম্পৃক্ত হলেন। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে মিনা নামক স্থানে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সামনে দুই কিশোরী দফ বাজাচ্ছিলেন এবং নৃত্য করছিল। নবী করিম (দঃ) চাদর মুড়িয়ে আরাম করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আগমন করেন এবং এই অবস্থা দেখে তিনি তা নিষেধ করেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদর থেকে চেহারা মোবারক বাহির করে নিজেই হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিষেধ করা থেকে বারণ করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আজ তাদের ঈদের দিন।

সেই ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য কিতাবে মজুদ আছে। যাদের ইচ্ছা হয় দেখে নিতে পারেন। আবু তালেব মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ছেমার বৈধতার ব্যাপারে একটি সংখ্যাগরিষ্ট দল থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। আর ইহা সাব্যস্ত করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, মুগীরা বিন শু'বা, মুয়াবিয়া ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছেমা শ্রবণ করেছেন। আর অনেক সলফে সালেহীন (ধার্মিক পূর্বপুরুষ) সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ উহা শুনেছেন এবং বলেন যে, হেজাযীগণ সর্বদা মক্কায় ছেমা শ্রবণ করতেন। বিশেষ করে বরকতময় দিনসমূহে অর্থাৎ আইয়ামে তাশরিক (কুরাবানীর দিন সমূহ অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ০৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ)। যেই দিন সমূহে আল্লাহ তায়ালা যিকির করার হুকুম দিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে মদীনায় মুনাওয়ারার অধিবাসীগণও বর্তমান সময় পর্যন্ত শুনে আসছেন। মূলতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এত সংখ্যক নির্ভর যোগ্য লোক ছেমা শ্রবণ করছেন যে, তাদের এক একজন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে সনদ পাওয়ার যোগ্য। যাইহোক, আমরা এত পরিমাণ সাহাবীদের বিষয়ে উল্লেখ করেছি। মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ এবং প্রতিটি সিলসিলার শায়খগণ থেকে ছেমা শ্রবনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। বেহেশতবাসী চিশতীয়া হযরতগণের জন্য ছেমা স্বয়ং রূহের খাদ্য। হযরত মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বয়ং হযরত মঈন উদ্দিন চিশতী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর ছেমার মজলিশে উপস্থিত হয়ে ছেমা শ্রবণ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নিজেই 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' গ্রন্থে ছেমা অধ্যায়ে অনেক দলিল প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। চার মাযহাবের ইমামগণও ছেমা শ্রবণ করেছেন। বিশেষ করে আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা কুফী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকে ছেমা শুনার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই, বর্ণিত আছে

যে, তাঁর এক প্রতিবেশী ছিল; যিনি প্রত্যেক রাত্রে গান গাইতেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তা শ্রবণ করতেন। একবার ইমাম ছাহেব তাঁর উক্ত প্রতিবেশীকে খুঁজে পেলেন না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তাকে আমির আইনী গ্রেফতার করেছেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং সেখানে গমন করেন এবং আমিরের কাছে তার ব্যপারে সুপারিশ করেন। আমির বললেন, আমি তো তার নাম জানি না। তিনি বললেন, তার নাম আমর। আমির নির্দেশ দিলেন যার নাম আমর তাকে ছেড়ে দাও। ইমাম ছাহেবের সুপারিশের বরকতে কয়েদখানায় যারা আমর নামধারী ছিল সবাইকে মুক্তি দেয়া হল। এবং উক্ত আমরও মুক্তি পেল। উক্ত ঘটনাটিকে আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুচি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বিশ্লেষণ করে লিখেন যে, উক্ত ঘটনায় ইমাম ছাহেব থেকে ছেমা শ্রবণ সাব্যস্ত হয়।

'রেসালায়ে আদাবির' গ্রন্থে 'কশ্‌ফ' নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) যখন হারুনুর রশিদ এর মাহফিলে গমন করতেন এবং ওখানে গান পরিবেশন করা হত, তখন তিনি ইহা শ্রবণ করতেন এবং ক্রন্দন করতেন। আর যখন তাঁর থেকে গানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি ইমাম ছাহেবের উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইমাম ছাহেব প্রতি রাতে ইহাতে (ছেমা) নিজের সময়কে অযথা নষ্ট করতেন না। অনুরূপভাবে, ইব্রাহীম বিন সা'দ যুহুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকে গান শ্রবণের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর ব্যাপারে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আহমদ গাযালী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন যে, তাঁর মাযহাবে গান হারাম নয়। অনুরূপভাবে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকেও ছেমা শ্রবণ করার ব্যপারে বর্ণনা পাওয়া যায়। নকশবন্দী হযরতগণ যদিও ছেমা কম শুনেন কিন্তু তাঁরা তা বৈধ বলে থাকেন । তাই, মওলানা কাযি ছানাউল্লাহ পানিপথী নকশবন্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহি); যিনি মুহাদ্দিস ও কুরআনের মুফাস্‌সির ছিলেন, যাঁকে মওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) দ্বিতীয় যামাখশারী উপাধি দ্বারা বিভূষিত করতেন। তিনি ছেমা বৈধ হওয়ার ব্যপারে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আর ইহা উছুলে ফিক্‌হ এর কায়েদা (নিয়ম-পদ্ধতি) দ্বারা সুস্পষ্ঠভাবে সাব্যস্ত হয় যে, যে বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন হাদিসের নস (নির্ভরযোগ্য বক্তব্য) নাই এবং সেই ব্যপারে কিয়াস করাও সিদ্ধ নয়, উহাকে (ছেমা) হারাম আখ্যায়িত করা বাতিল হিসেবে গণ্য। বরং উহাকে মুবাহ (বৈধ) বলা যাবে। উহা করলে কোন অসুবিধা নাই। কেননা প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক বস্তু ইবাহত (বৈধতা) এর

উপর প্রতিষ্ঠিত । যেমন ইহা অধিকাংশ হানেফী ও শাফেয়ী গণের নিকট গ্রহণযোগ্য। বরং নস (নির্ভযোগ্য দলীল) ও কিয়াস উভয়টি গান বৈধ হওয়ার ব্যপারে সাব্যস্ত করে। প্রথমে আমরা কিয়াসের বিষয়টি উল্লেখ করছি। লক্ষ্য করুন যে, গানের মধ্যে অনেকগুলো কথা একত্রিত থাকে। প্রথমে সবগুলো কথাকে আলাদা আলাদা করে দেখ। অতঃপর সামষ্টিক কথার দিকে লক্ষ্য কর যে, রাগ (গান) কি বস্তু ? সুমিষ্ট আওয়াজ ও ছন্দবদ্ধ আওয়াজ শ্রবণ করা; যার অর্থ বোধগম্য হয় এবং অন্তরে নাড়া দেয়, তা ভাল হওয়ার কারণে সুমিষ্ট আওয়াজ শ্রবণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা সুমিষ্ট আওয়াজ দ্বারা স্বীয় বান্দার উপর অনুগ্রহ করেছেন। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন, "তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন।" (সূরা ফাতির: ১)। উক্ত আয়াত থেকে দ্বীনের আলেমগণ সুন্দর আওয়াজ উদ্দেশ্য করেছেন।

আর হাদিস শরীফে আছে যে, "আল্লাহ তায়ালা সুন্দর আওয়াজ ব্যতীত কোন নবী প্রেরণ করেননি"। এবং আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ সুন্দর স্বরে পড়বেন আল্লাহ তায়ালা তার তেলোয়াত বেশী শুনেন। যেভাবে গান পরিবেশনকারী দাসীর গান তার মালিক শ্রবণ করে। আর হযরত দাউদ (আলাইহিস্সালাম) এঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, হযরত দাউদ (আলাইহিস্সালাম) নিজে নিজে কান্নাকাটি করতেন এবং সুন্দর আওয়াজে যবুর তেলোয়াত করতেন। হযরত আবু মুসা আশায়ারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দাউদ (আলাইহিস্সালাম) এঁর পরিবারের সুন্দর আওয়াজের একটি অংশ দেয়া হয়েছে। যদি ইহা বলা হয় যে, সুন্দর আওয়াজ কুরআন তেলোয়াতের জন্য বৈধ। তাদের থেকে জিজ্ঞেসা করা হয় যে, বুলবুলি পাখির আওয়াজ বা যে সমস্ত প্রাণীর সুন্দর সূর রয়েছে ইহাদের সুর শুনা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম? যখন প্রাণীর অর্থহীন সূর হারাম নয়। তাহলে সুন্দর সুর যাতে নিগূঢ় অর্থ ও রহস্য আছে তা কিভাবে হারাম হবে? ইহা স্পষ্ট যে, কতেক কবিতা সমূহ পরিপূর্ণ হিকমতে (প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান) ভরপুর। সেই কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, "যদি কবিতার কথা ভাল হয়, তাহলে ভাল। আর যদি মন্দ হয়, তাহলে মন্দ"। তাই নবী করিম (দঃ)ও ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় কতেক কবিতা হিকমতে (জ্ঞান-বিজ্ঞান) ভরপুর"। কবিতা পাঠকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারাম বলেননি এবং তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তীতেও কেউ হারাম বলেননি। বরং এখন গভীরভাবে দেখ, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলীম) এ হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে কবিতা পাঠের বিষয়ে প্রমাণ সাব্যস্ত আছে। আর হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত

বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর কবিতা পাঠের বিষয়েও প্রমাণ সাব্যস্ত আছে। আর বুখারী ও মুসলিম শরীফের এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ তা'হল- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান বিন সাবেত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্য মিম্বর তৈরি করান এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি [হাসান] প্রশংসামূলক কবিতাসমূহ পাঠ করতেন। তাই, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাঁর প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন যে, হাসানকে রূহুল কুদুস [পবিত্র আত্মা/ জিবরাঈল আঃ] সাহায্য করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (হাসান) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পক্ষ থেকে দুশমনদের ও অহংকারীদেরকে কবিতার মাধ্যমে জওয়াব দিয়ে থাকেন। নাবেগা যখন স্বীয় কবিতা হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সামনাসামনি পাঠ করেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দোয়া করেন।

হযরত আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সাহাবীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সামনে কবিতাবলী পাঠ করতেন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসতেন। আমর বিন শারিদ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আমর বিন শারিদের পিতা] বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সামনা সামনি উমাইয়া বিন সালত-এর কবিতা সমূহ থেকে পড়লাম। প্রত্যেক বার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছিলেন যে, আবারও পড়। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এই কবি যেন একজন মুসলমান। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জন্য হুদী (উষ্ট্রী চালানো সংগীত) পরিবেশন করা হত। আর আবহাছা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাসীদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হত। আর বারা বিন মালিক পুরুষদের জন্য আবহাছা পরিবেশন করতেন- "উট চালানো করার সময় তাড়াতাড়ি করো না। কেননা ইহার আরোহী কাঁচের পাত্র"।

আর উষ্ট্রীর পিছনে হুদী (উষ্ট্রী চালানো সংগীত) পরিবেশনের রেওয়াজ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সময়ে সর্বদা ছিল। আর এই ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত কবিতা সমূহ পরিবেশন করা হত যেগুলো সুন্দর আওয়াজ ও ছন্দবদ্ধ সংগীতের মাধ্যমে হত। কোন সাহাবী এইগুলো অস্বীকার করেননি। বরং নিজেরাই স্ব-উদ্যোগে উহা করতেন। আর ইহা সাধারণভাবে উট চালানোর জন্য হোক অথবা নিজেদেরকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হোক। এখন বাকি থাকল 'বাদ্যযন্ত্র'। ইহাও [বাদ্যযন্ত্র] মৌলিকভাবে হারাম নয়। বরং আনুষাঙ্গিক কারণে হারাম হয়ে থাকে। যখন উক্ত আনুষাঙ্গিক কারণসমূহ

থাকবে না, তখন ইহা (বাদ্যযন্ত্র) স্বীয় মৌলিক বৈধতার উপর বিদ্যমান থাকে। যখন মদ নিষিদ্ধ করা হল, তখন উহার (মদ) সাথে উহার উপকরণাদিও নিষিদ্ধ করা হল যাতে উপকরণসমূহ মূল মদের কথা স্মরণ করিয়ে না দেয়। লক্ষ্য কর যে, যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র পাপাচারি ব্যক্তি মদ্যপান করার সময় সঙ্গে রাখেনি সেগুলো হারাম হয়নি। আল্লামা আব্দুল গণি নাবলুচি হানাফি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ও শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ যাদেরকে লৌহ মানব হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং শীর্ষস্থানীয় যাহের ও বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ যাদেরকে শরীয়ত ও হাকিকতে স্বতন্ত্র জ্ঞানের অধিকারী জেনেছেন, তাঁরা নিজেদের কিতাবে লিখেন যে, 'ছেমা' গবেষক আলেমদের নিকট আম (ব্যাপক) অর্থবোধক শব্দ। ছেমা গানকে অন্তর্ভূক্ত করে। চাই ইহা তপস্যা বিষয় বস্তুর হোক অথবা গজল হোক অথবা অনির্দিষ্ট কোন গান হোক অথবা গান ব্যতিত বাদ্যযন্ত্র সহকারে হোক অথবা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হোক অথবা শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্র শুনা হয়ে থাকুক সবগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে।

আর বাদ্যযন্দ্রের ক্ষেত্রেও কোন পার্ধক্য নেই, তা দফ হোক অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র। আর দফের ক্ষেত্রে সমান তা যদি ঝাং বিশিষ্টও হয়। এটা সমান যে গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হোক বা গান ছাড়া বাদ্যযন্ত্র বাজানো হোক। এটা সমান যে, ইহা (বাদ্যযন্ত্র) বিয়ে শাদীতে বাজানো হোক অথবা ওলীমায় অথবা ঈদের দিন অথবা কেউ আগমন করার সময় অথবা যিকির ও তাহলিল পড়ার সময় অথবা হযরত (দঃ) এঁর উপর দরুদ পাঠের সময় অথবা বাজানো না হোক। এটা সমান যে, ব্যক্তি একাকী তার ঘরে অবস্থান করার সময় অথবা মসজিদে জ্ঞানী ও সৎকর্মশীলদের সমাবেশে থাকাকালীন সময়ে অথবা তাদের ব্যতিত অন্য কোন লোকের সাথে হোক। আর এটা সমান যে, হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা বিশেষ ব্যক্তিদের একত্রিত করণের উদ্দেশে হোক বা অনির্ধারতি সময়ের মধ্যে হোক, পুরুষদের জন্য হোক অথবা মহিলাদের জন্য হোক অথবা শুধু মহিলাদের জন্য হোক অথবা শুধু পুরুষদের জন্য হোক অথবা শুধু মহিলাদের জন্য হোক এই সবগুলোর নাম হল ছেমা। 'ছেমা' শব্দটি যখন বলা হয় তখন ইহাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এই সবগুলোর শরীয়তের হুকুমের ক্ষেত্রে এক, অন্য কোন অর্থ নেই যে, এই ছেমা ও ঐ ছেমার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে।

উল্লেখ্য, বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে কতেক আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কতেক আলেম কতেক বাদ্যযন্ত্র যেগুলো মদ্য পানকালীন সময়ে বাজানো হয়, তারা উহাকে হারাম বলেন। আর কতেক বিশেষজ্ঞ আলেম সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে সিদ্ধ বলে মত দেন। তাই, ইহা নাবলুচি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর কথা

থেকে জানা গেল। 'মালাবুদ্ধা মিনহু' ও 'তাফসিরে মাজহারী' এর গ্রন্থকার কাজি ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তিনিও স্বীয় 'ছেমা' পুস্তিকায় লিখেন যে, ইহার হুবহু বর্ণনা এই যে, বিবাহে দফ বাজানো রাসূলে করিম (দঃ) এঁর নির্দেশ ছিল। ইমাম মালেক ইহাকে [দফ] বিবাহের জন্য শর্ত বলেছেন। যখন বিবাহের ঘোষণা দেওয়ার জন্য দফ বাজানো হালাল অথবা মুস্তাহাব, তাহলে ঢোল, নাকাড়া (বাদ্যযন্ত্র বিশষ), সেতারা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও দফের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? যদি খারাপ উদ্দেশ্যে হলে সবটাই হারাম। আর সৎ উদ্দেশ্যে হলে সবটাই হালাল। বিবাহের ঘোষণা প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্র দিয়ে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দফ ও অন্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যকরণ বোধগম্য নয়।

'ছেমা'র আদব পাঁচটি। প্রথমটি হল, সময়, স্থান, সভায় সভ্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। দ্বিতীয়টি হল, কাওয়াল (গায়ক) যা কিছু পরিবেশন করে তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনা। তৃতীয়টি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভর হয় ততক্ষণ নড়াচড়া না করা। যখন উম্মাদনা প্রবল হয়, তখন যা কিছু নড়াচড়া করা হয় সবকিছু বৈধ। চাই চিৎকার করুক, চাই ক্রন্দন করুক, চাই না হাসুক, চাই হাততালি দিক সবকিছুকে যিকির বলা হয়। চতুর্থটি হল, দণ্ডায়মান হওয়ার সময় অপরাপর লোকদের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করা। পঞ্চমটি হল-শায়খ (পীরে কামেল) এর উচিত উপস্থিত লোকদের হাল (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ করা। যদি তাঁর মুরীদদের জন্য ছেমার কারণে ক্ষতি হয়, তখন তাদের সামনে রাগ (গান) শুনবেন না। যদি শুনেন তাহলে তাদেরকে (মুরিদ) অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত করে দিবেন।

চারটি কারণে রাগ (গান) হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। প্রথমটি হল, যদি গান পরিবেশনকারী মহিলা হয় যার দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল (সিদ্ধ) নয়। আর তার রাগ (গান) শ্রবণ করা দ্বারা ফেতনার আশংকা থাকে। আর ইহা হারাম (নিষিদ্ধ) এই কারণে যে, উহাতে ফেতনার আশংকা থাকে এবং এই নিষিদ্ধতা রাগের (গান) কারণে নয়। বরং যদি মহিলা এই রকম হয় যে, তার সাথে কথা বলা দ্বারা তার কণ্ঠস্বরের কারণে ফেতনার আশংকা থাকে, তখন তার সাথে কথা বলা সিদ্ধ নয়। এবং তার থেকে কুরআন তেলায়াত শুনাও জায়েজ নাই। আর ছোট ছেলেদের অবস্থাও অনুরূপ। তবে শর্ত থাকে যে, যদি ফেতনার আশংকা থাকে। দ্বিতীয়টি হল, নজম (গানের কথা বা কবিতা) এর মধ্যে যদি অশ্লীলতা থাকে। অর্থাৎ কবিতার মধ্যে অশ্লীলতা, অনর্থক কথাবার্তা এবং পরনিন্দা থাকে। আর যে সমস্ত কথা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা সাহাবায়ে কেরামদের (রাদিয়াল্লাহু

আনহুম) এঁর উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়। যেমন রাফেজিগণ সাহাবীদের শানে যে সমস্ত ব্যাঙ্গাতক কথাবার্তা রচনা করে যা উক্ত গানে বা কবিতায় বিদ্যমান থাকে অথবা কোন বিশেষ মহিলার অশ্লীল গুণকীর্তন থাকে, এই কথাবার্তা শুনা গানের সূরে অথবা গানের সূর ব্যতীত নিষিদ্ধ। আর শ্রবণকারীও পরিবেশনকারীর অন্তর্ভূক্ত। বেদাতীদের ব্যঙ্গ করা বৈধ। তাই, হযরত হাসান বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে নিন্দা করতেন এবং কাফিরদের নিন্দার জওয়াব দিতেন। এই ব্যপারে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

যৌবনের আলোচনা সংক্রান্ত কবিতাবলী অর্থাৎ দেহের রেখা ও তিলের আলোচনা, দেহের উচ্চতা ও অনুচ্চতা আলোচনা ইত্যাদি যেগুলি কসিদা ও গজল সমূহে প্রচলিত ইহাকে কবিতা আকারে পাঠ করা হোক, চাই ইহাকে সশব্দে পাঠ করা হোক বা নিঃশব্দে পাঠ করা হোক তা হারাম নয়। তৃতীয় প্রকার হল, শ্রোতার নিয়তে যদি কোন প্রকার ফ্যাসাদ (গরমিল) থাকে সেই অবস্থায় ফ্যাসাদের কারণে তার জন্য রাগ (গান) শ্রবণ করা হারাম হয়ে যাবে। কেননা, ফ্যাসাদ (গরমিল বা বিশৃংখল অবস্থা) এমন বস্তু যে, ইহা দ্বারা সমস্ত ইবাদত, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত বরং সমস্ত আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, হাদিসে এরশাদ হচ্ছে, "সমস্ত আমল (কাজ) সমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। নামাজ যেটি সর্বোত্তম ইবাদত যদি তা রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) এর নিয়তে সম্পাদন করা হয় তখন হারাম হয়ে যাবে। আর এতে নামাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক নয়।

চতুর্থটি হল, মজলিসে কোন প্রকার শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ সংঘটিত হওয়া যেমন মদ্যপান করা ইত্যাদি। এই চারটি কারণ সমষ্ঠিগতভাবে ও এককভাবে যে কোন গানের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ঐ গান হারাম (নিষিদ্ধ)। উচিত হবে যে, উক্ত কারণসমূহ দূরীভূত করা। এতে মূল ছেমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ইহা সাবধানতা থেকে মুক্ত। হাদিস ও ফিকহের কিতাব সমূহে রাগ (গান) হারাম হওয়ার ব্যপারে যে সমস্ত আলোচনা রয়েছে এই সবগুলো ঐ প্রকারের গান। আর এই নিষিদ্ধতা আনুষাঙ্গিক কারণে। ইহা সত্তাগতভাবে হারাম নয়। ইহা দ্বারা সব প্রকার গানকে হারাম বলা সরল পথ থেকে সীমালংঘন করার নামান্তর। রাগ (গান) আল্লাহ তায়ালার একটি গোপন রহস্য। ছন্দময় কবিতা আত্মার সাথে পূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি ইহা (কবিতা) আত্মা সমূহে আশ্চর্যজনক প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ কতেক গান দ্বারা আনন্দ সৃষ্টি হয়, কতেক গান দ্বারা বিষাদ, কতেক গান দ্বারা নিদ্রা ও কতেক গান দ্বারা

হাসি চলে আসে। কোন কোন কবিতায় এমন প্রভাব থাকে যে, ইহা দ্বারা ছন্দময় কবিতার উচ্চারণে হাত, পা, মাথা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর ইহা ধারণা করা উচিত নয় যে, এই বিষয়টি কবিতার অর্থ বুঝার মাধ্যমে হয়ে থাকে। বরং অবোধগম্য গানগুলি দ্বারাও এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমনকি বলা হয় যে, যে ব্যক্তিকে বসন্ত ও ইহার প্রস্ফুটিত পাপড়ি, সেতার (বাদ্যযন্ত্র) ও ইহার গান নাড়া দেয় না, তার মন মানসিকতা খারাপ। ইহার কোন তদবির (প্রতিষেধক) নাই। কবিতার অর্থ বোধগম্য হলে কেউ বলে যে, এই বিষয়টি তো সামান্য শিশুর মধ্যেও পাওয়া যায়।

কেননা যেখানে সুমিষ্ট স্বরে লরি (এমন গান যেটি মহিলাগণ শিশুদের কান্না থামানোর জন্য গেয়ে থাকে) গাওয়া হয়, তখন শিশুরা কান্না বন্ধ করে চুপ হয়ে উক্ত সুমিষ্ট স্বর (গান) শ্রবণ করে। উটের দিকে লক্ষ্য কর, বিবেকহীন প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও হুদী (আরবদের উষ্ট্র চালানো সংগীত) দ্বারা এমন প্রভাবিত হয় যে, ইহার কারণে ভারী ভারী বোঝা হালকা মনে করে। অত্যধিক আনন্দে দীর্ঘ দূরত্বকে সংকীর্ণ মনে করে। আর হুদীর নেশা উহার (উট) উপর এমনভাবে ছড়ে বসে যে, বিশাল মরুভূমিতে যখন বোঝার দ্বারা ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন যেখানে হুদীর আওয়াজ শুনে সেদিকে ঘাড় প্রসারিত করে এবং হুদীর আওয়াজের দিকে কান লাগিয়ে দ্রুত চলতে থাকে। এমনকি বোঝা ও হাওদা সবকিছু তার জন্য হালকা হয়ে যায়। কখনও বোঝার আধিক্যে এবং কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার কারণে মৃত্যুও ঘটে কিন্তু সেই সময় হুদীর আনন্দে উহা তার (উট) অনুভব হয় না। তাই আবু বকর মুহাম্মদ বিন দাউদ দিনুরী জুরকী হতে বর্ণনা করেন যে, আমি জঙ্গলে ছিলাম। আমার সাথে আরবের একটি গোত্রের সাক্ষাত হয়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত দেন এবং তার তাঁবুতে নিয়ে যান। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, একজন কালো বর্ণের দাস বন্দি আছে। দরজার সামনে কয়েকটি উট মরে পড়ে আছে। একটি মাত্র উট যেটি জীবিত আছে তা এত ক্ষীণ ও অসুস্থ; যেটি মরে যাওয়ার উপক্রম। উক্ত দাসটি আমাকে বলল, আপনি অতিথি এবং আপনার দায়িত্ব ও অধিকার আছে যে, আপনি আমার মালিকের কাছে আমার ব্যপারে সুপারিশ করবেন। কেননা তিনি মেহমানের খাতিরে সুপারিশ কবুল করেন। আপনার সুপারিশ উক্ত বিষয়ের জন্য ফিরিয়ে দিবে না এবং হয়ত আমাকে বন্দি দশা থেকে ছেড়ে দিবেন। যখন তিনি (মেজবান) খাবার নিয়ে আসেন, আমি খেতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই দাসটির ব্যপারে আমার সুপারিশ মনজুর করবেন না, ততক্ষণ আমি খাবার গ্রহণ করব না। উক্ত ব্যক্তি (মেজবান) বললেন, উক্ত গোলামটিতো আমাকে ফকির করে দিল। আমার

সমস্ত সম্পদ নষ্ট করে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি করেছিল? তিনি (মেজবান) উত্তর দিলেন, আমার মরে যাওয়া উটগুলো ভাড়ায় মাল পরিবহন করছিল। সে (দাস) উটগুলো দ্বারা অত্যধিক বোঝা বহন করেছিল। তার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। যখন সে হুদী পড়ছিল তখন উটগুলো তিনদিনের পথ একদিনে অতিক্রম করল। যখন উটগুলো থেকে বোঝা খালাস করা হল, তখন সব উট মরে গেল। শুধুমাত্র একটি উট বেঁচে থাকল। উহাও আবার কৃশ ও দূর্বল হয়ে গেল। কিন্তু আপনি আমার মেহমান, আপনার খাতিরে আমি এই গোলামটি আপনাকে দান করলাম। আমি চাই যে, আপনি তার কণ্ঠস্বর শুনবেন। উক্ত ব্যক্তি (মেজবান) গোলামকে বলল, হুদী পাঠ কর। সেই সময় উটগুলো কূপ থেকে পানি আনছিল। যখন সে তার কণ্ঠস্বর উঁচু করল, তখন সব উটগুলো এদিক সেদিক দৌঁড়াতে লাগল। এবং সমস্ত দড়ি সমূহ ছিড়ে ফেলল। আমিও মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললাম। আমি কল্পনা করতে পারছি না যে, আমি কখনও এই রকম উচ্চাঙ্গের কণ্ঠস্বর শুনেছি কিনা? উহা দ্বারা জানা গেল যে, রাগ (গান) এর প্রভাব অন্তরসমূহে উপলব্ধি হয়। আর যে ব্যক্তিকে রাগ (গান) নাড়া দেয় না, সে অপরিপক্ক ও মধ্যমপন্থা বিবর্জিত এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে। উট ও পাখি বরং সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু প্রকৃতিগতভাবে স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। সেই কারণে ছন্দবদ্ধ গান সবাইকে প্রভাবিত করে। শায়খ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

আরবী কবিতা শ্রবণ দ্বারা উটও অজদ (প্রেম বিভোরতা) ও মাতালতা শুরু করে,
যদি তোমার ছেমার স্বাদ না থাকে, তাহলে তুমি কুটিল প্রকৃতির প্রাণী।

সেইরূপ পাখি সমূহ হযরত দাউদ (আলাইহিস্সালাম) এঁর কণ্ঠস্বর শুনার জন্য বাতাসে থমকে যেত। একত্ববাদীদের সুলতান সূফী সম্প্রদায়ের সর্দার হযরত জোনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, সুফিয়া কেরামদের উপর তিনটি সময়ে রহমত বর্ষিত হয়। প্রথমটি হল- খাবার গ্রহণে সময়। দ্বিতীয়টি হল- যিকির করার সময় এবং তৃতীয়টি হল- ছেমার সময়। সেই কারণে সুফিগণ রাগ (গান) অজ্দ সহকারে শুনেন এবং আল্লাহ্র সামনে থাকেন। হে প্রিয় বন্ধুগণ! রাগ (গান) হালাল (বৈধ) হওয়ার ব্যপারে বুজুর্গ ব্যক্তিগণ অনেক বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাদের বেশি আগ্রহ হয় তারা সেগুলো যেন অধ্যায়ন করেন। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই জন্য এতটুকুতেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হল। আমাদের ভাইদের জন্য হযরত সুলতানুল মুকাররেবীন ফখরুল মুতাকাদ্দেমীন ওয়াল মুতায়াখ্খেরীন কুতুবুল্লাহিল আফখম গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছেমা শ্রবণ

করার বৈধতার দলীল এবং ছেমা মুস্তাহাব হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট। যার অনাদি জজ্‌বা (আবেগ ও অনুভূতি) রয়েছে তার ভঙ্গিতে অস্থিরতা বিরাজমান। মানবজাতি বেহেশতের বাগান ত্যাগ করে তুচ্ছ পৃথিবীর প্রান্তরে বন্ধুর অনুসন্ধানে বের হয়েছে। বরং প্রশস্ত অস্তিত্বহীন রাজ্যের বাসস্থান থেকে প্রশস্ত আবাদী অস্তিত্বময় রাজ্যে ইশক ও ভালবাসার প্রাচীন অঙ্গিকারকে সতেজ করার জন্য আগমন করেছে। প্রত্যেক যুগে পথ প্রদর্শক নবী ও অলীগণ এই ব্যপারে (প্রাচীন অঙ্গিকার) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন। যত আসমানী কিতাব ও সহিফা অবতীর্ণ হয়েছে অথবা আল্লাহওয়ালা আলেমগণ প্রণয়ন করেছেন সব গুলোই ইহার খাতিরে নিবেদিত।

গজল

আমি প্রেমাস্পদের প্রেমের তরবারি দ্বারা শহীদ হলাম,
হৃদয়ে রক্তক্ষরণে আমার চক্ষু হল সিক্ত।
তুমি আমার প্রিয়তম, ক্ষতস্থানের প্রতিষেধক,
হে প্রাণের মাসীহ! আমার দিকে শুভ দৃষ্টি দান কর।
কার কাছে গিয়ে আমি মনের অবস্থা বলব?
আমার হৃদয়ের সবটাই তোমার ইশকে রক্তাক্ত।
পাগলের মত কাতর ও নিরুপায় হয়ে ঘুরে ফিরি,
তোমার পাহাড়সম বিরহ-বেদনা সদা মাথায় নিয়ে ঘুরি।
হে প্রিয় প্রিয়তম! আমি তোমার ঘুঘু পাখি,
সর্বদা তোমার বিরহ বেদনায় কুকু করি।
আমি তোমার আত্মার সঙ্গী প্রতিটি ঢালে খুঁজে ফিরি,
এসেছি অস্তিত্বহীন জগত থেকে তোমার সন্ধানে।
আমার কাছে তোমার গলিরই কামনা ছিল,
আমার কাছে অনাদি কালের খোদায়ী হুকুমের জজ্‌বা ছিল প্রবল।
আমার হৃদয়ের কামনা-আমার উপর বিজয় লাভ করল,
জান্নাতুল খুলদ ও জান্নাতুন্নাঈমের আশা ছেড়ে এখানে এসেছি।
আমি জানি না ভুল ও সঠিক কি,
আমি জানি না ভাল ও মন্দও কি।
মকবুলের লাগাম তোমার হাতে বাঁধা,
আমার উদ্দেশ্য তুমি, আমার উপর অনুগ্রহ কর।

চতুর্থ ফরতুঃ তিন প্রকার নফ্সের (মানব সত্তা) বর্ণনা প্রসঙ্গে

গোপন থাকে না যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে ফেরেশতা প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতির দুটি শক্তি আমানত রেখেছেন। সেই কারণে মানবজাতি ফেরেশতা ও পশুর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুগসুত্র স্থাপনকারী। ফেরেশতা প্রকৃতির শক্তি আধ্যাত্মিক চাহিদা ও আধ্যাত্মিক আকর্ষনকে বুঝায়। আর পশু প্রকৃতির শক্তি স্বাভাবিক কামনা-বাসনা ও শারীরিক চাহিদাকে ইঙ্গিত করে। যখন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তি শারীরিক শক্তির উপর প্রাবল্য লাভ করে, তখন তার মর্তবা (স্তর) আল্লাহ্র দরবারে ফেরেশতাদের থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর যখন শারীরিক শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তির উপর প্রাবল্য লাভ করে, তখন তার স্তর পশুদের স্তর থেকে অনেক কমে যায়।

কবিতাংশ

আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করে উভয় গুণের সংমিশ্রণে (ফেরেশতা গুণ ও পশু গুণ),
তার মধ্যে ফেরেশতা গুণ ও পশু গুণ রয়েছে মিশ্রিত।
সে যদি এইদিকে (পশু গুণ) ঝুঁকি পড়ে,
তাহলে সে খারাপ বা পশুতে পরিণত হয়,
সে যদি ঐদিকে (ফেরেশতাগুণ) ঝুঁকে পড়ে, তাহলে সম্মানিত ও উত্তম
ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

যে সময় এই পৃথিবীটা মাতৃগর্ভাশয় থেকে দৃশ্যমান জগত চরাচরে অস্তিত্ব লাভ করে, তখন দৈহিক শক্তি ও পাশবিক প্রকৃতির দূর্বলতার কারণে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি ও ফেরেশতা প্রকৃতির প্রাবল্যের কারণে পরিপূর্ণভাবে ফেরেশতা প্রকৃতির উপযোগী ছিল। আর ফেরেশতাদের সংস্পর্শের মাধ্যমে সতেজ থাকত। ফেরেশতা বৈশিষ্ট্য হল পাপশূন্যতা বরং উহাকে (মানব) সামগ্রীকভাবে ফেরেশতা গণ্য করা হত। যখন ধীরে ধীরে পাশবিক প্রকৃতি ফেরেশতা প্রকৃতির উপর প্রবল হয় এবং মানবিক চাহিদা ফেরেশতা প্রকৃতির উপর প্রবল হয়, আর বিবেক ও অনুধাবন শক্তি এবং সমস্ত শক্তিসমূহ স্বীয় পূর্ণ সীমায় পৌঁছতে লাগল, তখন তার (মানব) আধ্যত্মিক শক্তি দূর্বল ও ফেরেশতা প্রকৃতি ক্ষয়িষ্ণু হতে লাগল। ফলে সে ঐশী দরবার ও উর্ধজগতের উষ্ণ সংস্পর্শের উপযুক্ততা থেকে অবনমিত হয়। কেননা ক্বলব (অন্তঃকরণ) এর দুইটি দ্বার রয়েছে। তা হল- ফওক্বানিয়া (উর্ধমুখী দ্বার) ও তাহতানিয়া (নিম্নমুখী দ্বার)। যতক্ষণ পর্যন্ত ফওক্বানিয়া (উর্ধমুখী দ্বার) খোলা থাকে, তখন তাহতানিয়া (নিম্নমুখী দ্বার) বন্ধ থাকে। আর যখন তাহতানিয়া (নিম্নমুখী দ্বার) খোলা থাকে, তখন ফওক্বানিয়া (উর্ধমুখী দ্বার) নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

এখন এখানে একটি কথা জানা অত্যন্ত জরুরী। ইহা হল এই যে, মানুষের সত্তায় তিনটি নফ্স (মানব সত্তা) বাদশাহ হিসেবে বিদ্যমান। প্রথমটি হল- আম্মারা অর্থাৎ পাপ কার্যে প্ররোচনা দানকারী, খারাপ কাজে এবং আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার প্ররোচনা দানকারী নফস। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ।" (সূরা ইউসুফ: ৫৩)। দ্বিতীয়টি হল- লাওয়ামা অর্থাৎ স্বীয় কৃতকর্মের উপর তিরস্কারকারী নফস। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।" (সূরা ক্বিয়ামাহ: ২)। তৃতীয়টি হল- নফ্সে মুতমাইন্না অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণের সাথে প্রশান্তি লাভকারী ও আরামবোধকারী নফ্স। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"(সূরা ফজর: ২৭-৩০)। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি নফ্স (মানব সত্তা) এক নফ্স। কেননা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। কেউ কেউ নফ্সে মুলহিমাকে আরেকটি নফ্স হিসেবে সাব্যস্ত করে চারটি নফ্সে বিভক্ত করেছেন। মূলতঃ ইহা (নফ্সে মুলহিমা) উক্ত তিন প্রকার বাদশাহী নফ্সের প্রজ্ঞামন্ত্রী। যেমন নফ্স নামক বাদশাহটি স্বীয় তিন অবস্থায় তিনটি নাম ধারণ করে। অনুরূপভাবে, পরামর্শক মন্ত্রী আকল (বিবেক) এরও বাদশাহ নফ্সের অনুসরণে তিনটি অবস্থায় তিনটি বৈশিষ্ট্য যথা শুভ কামনা, অশুভ কামনা এবং উভয়ের (শুভ ও অশুভ) মধ্যবর্তী আকাংখা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে।

যখন বাদশাহ নফ্সে আম্মারা প্রাপ্ত বয়স্কের সীমায় পৌঁছে, তখন অত্যন্ত জাঁকজমক, শান-শওকত, প্রদর্শনীয় ও সাজ-সজ্জার সাথে বাদশাহী সিংহাসনে আরোহন করে। সেই সময় চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদ (খোদা) ও প্রকৃত বন্ধু (আল্লাহ) স্বীয় অনন্ত রহমত ও অসীম দয়া দ্বারা সৌভাগ্য, সফলতা ও হেদায়তের পথের পথপ্রদর্শক তার কাছে প্রেরণ করেন। তাঁকে (পথপ্রদর্শক) স্বীয় নামের পবিত্র কিতাব অর্থাৎ কুরআন দ্বারা সুমিষ্ট আহবান দ্বারা বার্তা প্রেরণ করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।" (সূরা দাহর: ৯)। এই আয়াতটি দ্বারা পূর্ববর্তী একীভূত সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রেমাস্পদের সম্মানবোধ সম্পর্কে নফ্সের প্রতিদ্বন্দী ও শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে সতর্ক করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"(সূরা ফাতির)। তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। স্বীয় অত্যন্ত অনুগ্রহ ও লালন পালনের মাধ্যমে তার (বান্দা) বিশ্বাসঘাতকতার দিকে

দৃষ্টি না দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের আহবান দ্বারা- "অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফজর: ২৯-৩০) তাকে (বান্দা) বিরহ বিচ্ছেদের অতল গহবর থেকে মিলন ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে বার বার আহবান করেন। যখন নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী, আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।" (সূরা ফোরকান: ২৯)। যখন সে শয়তানী বিভ্রান্ত ও নফ্সের প্ররোচনা দ্বারা উক্ত বিশ্বাসঘাতকতার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে, তখন নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য হয়- "অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।"(সূরা আনয়াম: ৯১)। এই আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী, "নিশ্চয় আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৭), তখন তাকে [বান্দা] আবকাশ দেন। আর স্বীয় সুরক্ষার শুভদৃষ্টি তার থেকে তুলে নেন। তখন বাদশাহ নফ্সে আম্মারা স্বীয় চারটি রুকন (উপাদান) পানি, আগুন, মাটি ও বায়ুকে ভারসম্যহীনের উপর প্রতিষ্টিত করে মন্দ মন্ত্রী খারাপ কৌশলী আকল (বিবেক) কে মন্ত্রণালয়ের দোয়াত ও কলম অর্পন করে সুদৃঢ়ভাবে তাগিদ করতে থাকে যে, আমাদের সাম্রাজ্যের আবাদী, মঙ্গল এবং অতিরিক্ত উন্নয়ন, কোষাগারের পূর্ণতা অর্থাৎ মদ্যশালা ও মদ খানার আধিক্য এবং হারাম উপার্জনের প্রতিষ্ঠান ও মদ্যশালার আধিক্য, খেলাধূলা, হারাম কর্ম, প্রতারণা ও ইত্যাদি গুনাহের কাজের মধ্যে রাত-দিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে রত থাকার জন্য সর্বদা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতে এবং কখনো বাদশাহ নফ্সে মুতমাইন্নার গুপ্তচরসমূহকে আমাদের সাম্রাজ্যের সীমনায় প্রবেশ করতে না দেয়া এবং প্রতিটি মুহূর্তে নিম্নোক্ত হাদিসের মর্মমতে, "নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তে প্রবাহিত হয়"। ইহা (শয়তান) মানুষের রগ, ধমনী ও অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম অনুযায়ী, "শয়তান তারা যারা মানুষের অন্তরে প্ররোচনা দান করে"। প্ররোচনা দান, উদ্বিগ্নতা তৈরিতে প্ররোচনা দানকারী শয়তানকে তাগাদা দেওয়া, কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয়ের ধনাগারকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের ধনাগারে পরিপূর্ণ করে রাখা ইত্যাদি ব্যপারে তাগাদা দিতে থাকে। তখন তার (মানুষ) অসুস্থ বিবেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর মেষপালকের মালিক, দারোয়ান, কোতোয়াল ও গুপ্তচরের স্থলাভিষিক্ত হয়। সিপাহীগণ ও প্রজাগণ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ আদায় করার ব্যপারে পরিপূর্ণভাবে নজরদারি করতে থাকে। যেখানে স্বীয় কর্ম সম্পাদনে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় না অর্থাৎ পাপ, অনৈতিকতা, অহংকার, দম্ভ, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, শত্রুতা, অবাধ্যতা, চুরি,

অশ্লীলতা, বলৎকার, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুটতরাজ, রাহাজানি, হত্যা, রক্তপাত, মিথ্যা বলা, প্রতারণা, রাগ, ক্রোধ, ছিনতাই, হারাম ভক্ষন, পথভ্রষ্টতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ইত্যাদি প্রকাশিত দেখতে পাবে।

দান-খায়রাত, যাকাত, বরকত, পূণ্য, নামাজ, রোজা, হজ্জ, ফিতরা প্রদান, কুরবানী, মানত, আতিথেয়তা, কুরআন তেলোয়াত, ইবাদত, সত্য পথ প্রদর্শন, উপদেশ, আল্লাহ্‌র যিকির, পরকালের চিন্তা, শরীয়তের বিধি-বিধান পালন, তরিকতের রুকন সমূহ প্রতিপালন, হাকিকতের পথ অতিক্রম করা, মা'রিফতের পথে পৌঁছা ও ইত্যাদি কখনো প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হতে দেখবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় পূণ্য কাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মোচন করে।" (সুরা হুদ)। এই আয়াতের মর্ম মতে মন্দ কাজ সমূহ ভাল কাজের দ্বারা পরিবর্তিত হতে দেখবে না। মূলতঃ ইন্তেজাম (ব্যবস্থাপনা) সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সমস্ত কর্মচারী ও সব প্রজা নিম্নোক্ত কথার মর্ম অনুযায়ী-" মানুষ তাদের বাদশাহের ধর্মের উপর বিদ্যমান থাকে"। প্রত্যেক মুহুর্তে পাপ সম্পাদনে নিমগ্ন থাকে। মন্দ ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কোন ভাল কাজ ও হেদায়ত কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশিত হতে দেখবে না।

শেষ পর্যন্ত যখন ইহার সাম্রাজ্যের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার কাছে প্রকৃত বাদশাহ ও প্রকৃত সম্রাট (আল্লাহ) এর জালালত (মহানত্ব) ও কুদরত (ক্ষমতা) এর ওয়ারেন্ট গ্রেফতারি পরোয়ানা এসে পৌঁছে। হযরত রাব্বে জলিল (মহান প্রতিপালক) এর ক্রোধ নিম্নোক্ত বাণীর হুকুম অনুযায়ী প্রযোজ্য হয়- আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহুর্তে পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।" (সূরা আরাফঃ ৩৪)। ইহা [ক্রোধ] তওবা ও ক্ষমার অবকাশ ব্যতিত খোদায়ী ক্রোধ ও বাধ্যবাধতা দ্বারা তার ঘাঁড় পাকড়াও করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়। সেই সময় নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের উপযোগী হয়ে চিরন্তন দূর্ভাগ্য দ্বারা ফলাফল লাভ করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আছরঃ ২)। আর নিম্নোক্ত বাণী অনুযায়ী খোদায়ী বিচ্ছেদ ও চিরন্তন বিরহ বিচ্ছেদের কারাগারে বন্দি ও গ্রেফতার হয়ে স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে।" (সূরা হুদঃ ১০৬)। কেননা প্রত্যেক বস্তুর সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্য উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা ও অর্জন না করার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে বস্তু যে উদ্দেশ্যে সৃজন করা হয়েছে, সে উদ্দিষ্ট

লক্ষ্য যদি ভালভাবে অর্জিত হয় তখন উক্ত বস্তুকে সৎকর্মশীল ও সৌভাগ্যবান মনে করা হয়। নতুবা উহাকে দূষ্কর্মা ও দূর্ভাগ্য মনে করা হয়। যেমন কলম কাটছাটকারী দ্বারা পরিছন্নভাবে কলম কাটছাটই মূল লক্ষ্য। যদি এই লক্ষ্য ইহা দ্বারা ভালভাবে অর্জিত হয়, তাহলে ঐ কলম কাটছাটকারী ভাল ও পছন্দনীয় মনে করা হয়। যদি এই লক্ষ্য ইহা দ্বারা ভালভাবে অর্জিত না হয়, তখন ঐ কলম কাটছাটকারী মন্দ ও খারাপ মনে করা হয়। সেইরূপ লক্ষ্য কর যে, মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল- নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী পবিত্র সত্তা খোদা তায়ালার পরিচিতি, সর্ব শক্তিমান ও অনুগ্রহকারী সৃষ্টিকর্তার ভালবাসা ও ইশক (প্রেম) এর অঙ্গিকার পূর্ণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল যারিয়াত: ৫৬)। অতএব, যখন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি; যেটার উপর শরীয়তের বিধান পালনের কষ্ট সহ্য করা নির্ভরশীল পূর্ণ সীমায় পৌঁছে এবং শৈশব অবস্থা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক স্তরে পৌঁছে নিম্নোক্ত বাণীর হুকুম অনুযায়ী উক্ত মানব সৃষ্টির উদ্দিষ্ট লক্ষ্য আল্লাহ্‌র শরীয়তের ভাষায় তার থেকে চাওয়া হয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "তোমরা আমার অঙ্গিকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের অঙ্গিকার পূর্ণ করব।" (সূরা বাকারা)। আর তার হিম্মতের (মনোবল) পরীক্ষা করার জন্য নফ্‌স (মানবসত্তা) নামের কুকুরটিকে তার খোদা অনুসন্ধানের পথে এবং প্ররোচনা প্রদানকারী খান্নাসকে (প্ররোচনা দানকারী শয়তান) তার অন্তঃকরণের দ্বারে প্রহরীর মত বসিয়ে দেয়া হয়। যাতে প্রত্যেক মিথ্যা দাবিদার বন্ধুত্বের বিশেষ অঙ্গনে দায়িত্ব ভার না পায়।

কবিতা

আমার প্রেমাস্পদ বলল, আমার ঘরের দরজায় বসে থাক,
যে আমার গুপ্তরহস্য সম্পর্কে খবর রাখে না সে যেন ভিতরে না যায়।

সেই সময় আলাস্তু'র ('আমি কি তোমাদের প্রভু নই'?- আত্মার জগতের এই অঙ্গিকার) প্রতিশ্রুত অঙ্গিকারকে স্বীকার করা বা অস্বীকার করার কারণে বিপরীত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তার তৈরী হয়। অতএব, যদি সেই সময় সে অস্বীকারকারী হয়, তখন তার দূর্ভাগ্য প্রভাব বিস্তার করে এবং নফ্‌স নামের কুকুরটি ও প্ররোচনা দানকারী শয়তান প্রকৃত বিশ্বস্থ বন্ধু অনুসন্ধানের রাস্তায় বিবিধ প্ররোচনা, বিবিধ উৎকণ্ঠা দ্বারা পার্থিব উপভোগ্য বস্তু হারিয়ে যাওয়ার ভয় ভীতি প্রদান করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।" (সুরা বাকারা: ২৬৮)। এবং দিন রাত আট প্রহরব্যাপী নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুম অনুযায়ী ধ্বংসশীল দুনিয়ার অর্থহীন বিষয়গুলোকে অলংকার ও সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত

করে তার অন্তরে আলোকছটা দান করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪)। অতএব, তারা অর্থহীন কামনা-বাসনার নেশাতে মত্ত হয়ে আলাস্তু'র অঙ্গিকারকে অস্বীকারকারী হয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী বেহেশতী শরাব থেকে বঞ্চিত থেকে যায় । আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন "শরাবান তহুরা" [পবিত্র শরাব] (সূরা আদ্দাহার: ২১)। আর বাদশাহ নফ্‌সকে পথভ্রষ্ট করার কারণে এবং প্ররোচনা দানকারী খান্নাসের বিভ্রান্ত করার কারণে মানব সৃষ্টির উদ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং মা'রেফতের প্রকৃত সম্পদ ও খোদায়ী ইশক (প্রেম) ও ভালবাসার নিয়ামত তার থেকে হারিয়ে যায়। নিম্নোক্ত বাণীতে ঘোষিত হচ্ছে, "যদি আদম সন্তানের অন্তঃকরণে শয়তান ঘুরাফিরা না করত। তাহলে অবশ্যই তাদেরকে দেখতে পেতে স্বর্গ রাজ্যে"। আর নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম মতে স্থায়ী দূর্ভাগ্য ও চিরন্তন ক্ষতি দ্বারা তার কর্ম প্রতিদান লাভ করে। ইরশাদ হচ্ছে- "সে ইহকাল ও পরকাল ক্ষতি গ্রস্থ করেছে।" (সূরা হজ্জ)। যদি সাহায্যকারী বন্ধু ও বন্ধুত্বের তাওফিক হয় এবং অনাদি সৌভাগ্যের প্রেমাস্পদ অদৃশ্য থেকে চেহারার দর্শন দান করেন এবং আল্লাহ্‌র রহমত তার অবস্থার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। আর বাদশাহী ফযিলতের বারি তার ত্রুটি সমূহের ক্ষতিপূরণ দিতে থাকে। আর আলাস্তু'র স্বীকারোক্তি যদি প্রভাব বিস্তার করে, তখন বাদশাহ নফ্‌স লাওয়ামা আত্মসম্মানবোধে ও শান-শওকতের সাথে বাদশাহীর সিংহাসনে আরোহন করে উপবেশন করে এবং সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় নিমগ্ন থাকে। আর বাদশাহ নফ্‌সে আম্মারার সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে নিজেকে তিরস্কার ও নিন্দা করে। নিজের হারিয়ে যাওয়া বস্তুগুলোর ক্ষতি পূরণের জন্য সুদৃঢ় কোমরকে বাঁধে। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক আশেককে (প্রেমিক) প্রথমে সামান্য ছাড় দেন, যাতে উক্ত আশেক উক্ত প্রেমের স্বাদ উপভোগের চেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালায়। অতঃপর কিছু পরিমাণ দ্বার (প্রেমের দরজা) উম্মুক্ত করে বন্ধ করে দেন, যাতে আশেক অধিক অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে ইশকের পূর্ণ সীমায় পৌঁছে। সেইরূপ তিনি পবিত্র সত্তা অনাদিতে প্রথমে ভালবাসার পাশা খেলা খেলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিবসে উক্ত ইশক এর অঙ্গিকারনামা গ্রহণ করেছেন। অতঃপর পৃথিবীতে উক্ত ইশকের রশ্মি আশেকের উপর অবতীর্ণ করে নিজের (আল্লাহ) অনুসন্ধানে হয়রান ও ব্যাকুল করে তুলেন এবং প্রেমের লাজুকতা দান করেন। আর তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রেমিকের

সাথে মিলন ঘটে না যাতে তার ইশক পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে। আর নফ্সে লাওয়ামাকে খোদা অনুসন্ধানের আগুনের লৌহখণ্ড বানিয়ে তার বক্ষে বেদনার আগুন ও তিক্ত স্বাদের বিচ্ছেদের দহন দ্বারা প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করতে থাকে । যাতে উক্ত তিক্ত বিচ্ছেদের পর সুমিষ্ট মিলনের স্বাদ তার ভালভাবে অর্জিত হয়। যেহেতু এই বাদশা (নফ্স) ও তার মন্ত্রী আকল (বিবেক) উভয়টি পরাধীন ও কম ধৈর্যশীল, সেই কারণে ইহার সাম্রাজ্যে কখনও নফসে আম্মারার প্রাবল্য ও অগ্রগামিতা সংঘটিত হয়। আবার কখনও বাদশাহ নফ্সে মুতমায়িন্না নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা দেখায়।

মূলত উক্ত টানা-হেঁচড়ার কারণে উহার (নফ্স) প্রজাগণ কোন একটি হুকুম (বিধান) এর উপর স্বাধীন ও স্থির থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদ কাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"(সূরা তওবা: ১০২)। এই পরাধীন বাদশাহ এবং দূর্বল মন্ত্রী আকল (বুদ্ধি) এর মতামত দ্বারা এই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হয় না। আকস্মাৎ তৌফিক (সক্ষমতা) এর সূর্য নিম্নোক্ত বাণীর মর্মানুযায়ী পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে।" (সূরা মায়েদা: ৫৪)। আর মুর্শিদে কামেল (কামিল পথপ্রদর্শক) ও কামিল পীরের অনুসন্ধানে ব্যাকুল ও অস্থির বানিয়ে দেয়। যদি ফকির করিমের (আল্লাহ) আশেক হয়, করিমও (আল্লাহ) ফকিরের আশেক হয়, বরং ইশক করিমের মূল বিষয়বস্তু। আর ফকিরের ইশক তাঁর (আল্লাহ) ছায়া। আরেফ রুমি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন-

মসনবী

দান-খয়রাত ভিখারী ও দরিদ্রদের সন্ধান করে,
যেরূপ সৎ ব্যক্তিরা একটি পরিস্কার আয়না সন্ধান করে।
সুন্দর মুখ আয়নাতে সুন্দর দেখায়,
যেভাবে অনুগ্রহ বা দান ভিক্ষুকদের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় বা সুন্দর দেখায়।
দান-খয়রাত মুখাপেক্ষী এবং ইহা উহার সন্ধানকারীকে তালাশ করে,
যেরূপ তওবা তওবাকারীকে তালাশ করে।
কানে উচ্চস্বরে ডাক আসে, আহবান করে বলে,
এসো হে অন্বেষণকারী!- দান-খয়রাত ভিখারীকে তালাশ করছে, যেরূপ
ভিখারী দান-খয়রাত তালাশ করে।

এই জন্য আল্লাহ্‌র বাণী يحبّهم (তিনি তাঁদের ভালবাসেন) শব্দটিকে يحبّونه (তাঁরাও তাঁকে ভালবাসেন) এর উপর অগ্রগামী করা হয়েছে।

কবিতা

ইশক প্রথমে প্রেমাস্পদের সত্তায় হয় প্রকাশিত,
পরে প্রেমিকের কাছে গিয়ে ইহা জোর দেখায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে খোদায়ী তওফিক সহযোগিতা করবে না, কখনো বান্দা মওলার (আল্লাহ) ইশক (প্রেম) ও মহববত (ভালবাসা) এর রাস্তায় পা রাখতে পারবে না। এবং ইশক ও মহববতের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভরবে না। তাফসিরে হোসাইনীতে আছে, "যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে"- এই আয়াতাংশের ব্যপারে আল্লাহওয়ালা আলেমদের অনেক মতামত রয়েছে। শরীয়তপন্থীগণ বলেন, বান্দার প্রতি খোদার ভালবাসা হল এই যে, পৃথিবীতে তাকে (বান্দা) সামর্থবান করবেন ও হেদায়ত দান করবেন এবং পরকালে তাকে ছওয়াব ও সম্মান দান করবেন। আর খোদার প্রতি বান্দার মহববত হল এই যে, বান্দা জান-প্রাণ দিয়ে তাঁর (আল্লাহ) আনুগত্য ও ইবাদতে রত থাকবে এবং তাঁর অবাধ্যতা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। তরিকতপন্থীদের নিকট বান্দার প্রতি খোদার ভালবাসা হল এই যে, বান্দাকে তাঁর (আল্লাহ) নৈকট্যপূর্ণ দরবারে দুইটি বন্ধুত্বের আত্মা দেবেন এবং তাকে নিজের (আল্লাহ) নৈকট্যের জন্য খাস করে নিবেন। আর আল্লাহর সাথে বান্দার মহববত হল এই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজের অন্তরের আঙ্গিনাকে অন্যের ভালবাসা থেকে মুক্ত করবে এবং সর্বদা তাঁর (আল্লাহ) ভালবাসায় নিঃশ্বাস পূর্ণ করবে। আহলে হাকিকতগণ বলেন, খোদা তায়ালার মহব্বত চিরস্থায়ী এবং বান্দার মহব্বত অস্থায়ী।

কবিতা

যখন অনন্ত ও স্থায়ী গুণাবলী প্রকাশ পায়,
তখন অস্থায়ী গুণাবলী বিছানাকে পুড়ে ফেলে।

যখন আল্লাহ জুল-জালালের মহব্বতের প্রভাব প্রতিপত্তি ও জাঁকজমক তাবু থেকে নিম্নাক্ত আয়াতাংশের মর্ম মতে-"তিনি তাদের ভালবাসবেন।"- প্রেমিকের লয়প্রাপ্ত সত্তার বিপর্যস্ত পাত্রে নিক্ষেপ করেন, তখন "তারা তাঁকে (আল্লাহ) ভালবাসবেন" এই বাণীর ফুৎকারের সুগন্ধি প্রাপ্ত হয়ে উক্ত ধ্বংসশীল বান্দা বাকা গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। অতঃপর খোদার সাথে বান্দার ভালবাসাকে মওলার (আল্লাহ) লাহুতিয়তের (অসীম দর্শন বা ঐশ্বরিক জগত) মধ্যে ফানা (বিলীন) করাই হল বান্দার নাছুতিয়ত (মানব প্রকৃতি)। বান্দার সাথে মওলার মহব্বত হল বান্দার নাছুতিয়তের (মানব প্রকৃতি) ফানার

(বিলীন) মধ্যে স্বীয় লাহুতয়তের বাক্বা (বিদ্যমানতা)। 'মানাযিলে সায়েরীন' গ্রন্থে হযরত খাজা আব্দুল্লাহ আল আনসারী হারভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, হেদায়তের ক্ষেত্রে মহব্বত (ভালবাসা) উপভোগ্য হয়ে উঠে ও আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রেও যদিও বিচ্ছেদের বিভিন্ন কারণ থেকে মুক্ত থাকে এবং শেষ পরিণতিতে একক সত্তা আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব হয় সাথে সাথে নব উদ্ভাবিত নাম সমূহ অনাদি নাম সমূহে লয় ঘটে। 'লুমআত আ-নারুল্লাহ কুলুবুনা বেলুমআতি কামালাতিহি' প্রণেতা বলেন, মহব্বত (ভালবাসা) হল স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রতি সুন্দরের আকর্ষণ। আর উক্ত আকর্ষণ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটি 'মাইল জমা বিজমা'। আর ইহা হল- কোন প্রকার জগতের মাধ্যম ব্যতিত প্রকৃত সত্তার দর্পনে সত্তাগত সৌন্দর্য্যকে দর্শন।

চতুষ্পদী কবিতা

প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্যের গুপ্ত রহস্য কেউ চিনতে পারেনি,
তবুও সে অনন্ত রাজ্যে (আত্মার জগত) উত্তম পতাকা উত্তোলন করেছেন,
অর্থাৎ বলেছেন, তুমি আমাদের প্রভু।
আত্মার জগতে ছিল না পার্থিব ইশকের শরাব, ছিল না মহব্বতের আকর্ষন,
ইহা নিজেই নিজের ইশকের পাশা খেলায় পরাজিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি হল-' মাইল জমা বে-তাফসীল'। ইহা হল- চুড়ান্ত প্রকাশকারী একক সত্তার দর্পনে স্বীয় সৌন্দর্য্যের চমক বা উজ্জ্বলতাকে মোশাহাদা (দর্শন) করতে থাকবে এবং নিজের পূর্ণ গুনাবলীকে চিন্তা করতে থাকবে।

চতুষ্পদী কবিতা

প্রিয়তম! ইশকের শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাউকে সিক্ত করে,
কেউ কামনা বাসনার হাত দিয়ে উহার আঁচল আকড়ে ধরা উচিত নয়।
বস্তুজগতের ক্ষুদ্র কণাগুলো খোদার নূর দর্শনের দর্পন,
ইশক নিজেই ইহার নিজের জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়টি হল- 'তাফসিল বি তাফসিল'। যেহেতু অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তিবর্গ সাধারণ সৌন্দর্য্যকে নিদর্শনযুক্ত বিস্তৃত দর্পনে দর্শন করে থাকে এবং সীমাবদ্ধ বা শৃংখলিত বস্তুকে অর্গলমুক্ত বস্তুর প্রকাশস্থল মনে করে। আর উহার মিলনের স্বাদে তৃপ্ত এবং তার ভালবাসা ও বিচ্ছেদ দ্বারা ব্যথাতুর হয়।

কবিতা

হে সুন্দর প্রিয়তম! পর্দার অবগুণ্ঠনে দীপ্তি ছড়াও,
যাতে শত প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ জন্ম লাভ করে।
তোমার (ইশক) সুগন্ধি দ্বারা লায়লা মজনুর হৃদয় হরণ করে,
তোমার (ইশক) কামনার কুমারী বিরহ কাতরতায় ভোগে।

চতুর্থটি হল-'মাইল তাফসিল বি জমা'। যেহেতু কতেক বিশেষ ব্যক্তি চিন্তার ঘোড়াকে বস্তুগত কর্মকাণ্ড ও প্রভাবের বাইরে চক্কর দিয়ে থাকেন। আর তাঁরা যখন অবস্থাদি ও গুণাবলির অন্তরায় ও পর্দাকে; যেটি অস্তমান ও নিদর্শনাদির স্থলাভিষিক্ত সেটি অতিক্রম করেছে এবং সুউচ্চ গুণের অধিকারী, সুউচ্চ দরজার অধিকারী মহান সত্তা আল্লাহকে নিজের মুখের কিবলা বানালেন।

কবিতা

আমার হৃদয় বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করেছে,
আমার হৃদয় দিক সমূহের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।
আমার হৃদয় বৈশিষ্ট্য সমূহের বিবরণ থেকে মুক্ত,
আমার হৃদয় খোদার সত্তার বিকাশ দর্পন।

অতএব, এই বাক্যটি প্রকৃত ঘোষণা থেকে বুঝা যায় যে, "তিনি তাদের ভালবাসেন।" এই বাক্যংশটি 'মাইল জমা বি তাফসিল' এর অন্তর্ভূক্ত এবং "তারাও তাঁকে ভালবাসবেন" এই বাক্যংশটি 'মাইল তাফসিল বি জমা' এর স্তরের দিকে ইঙ্গিতবহ। হযরত খাজা ওবাইদুল্লাহ আহরার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় রিসালায় (পুস্তিকা) লিখেন যে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, পূর্ণ সত্তা হযরত জুলজালাল ওয়াল জামাল আল্লাহ তায়ালার মহব্বত বা ভালবাসার স্তর সমূহের প্রত্যেক স্তরে স্বীয় জাত বা সত্তার দ্বারা ভালবাসার পাশা খেলা খেলেন। অন্য কারো দ্বারা নয়।

পংক্তি

তিনি তাঁদের ভালবাসেন এবং তাঁরা তাঁকে (আল্লাহ) ভালবাসেন ইহা কেমন স্বীকৃতি,
স্বীয় পর্দার অবগুণ্ঠনে তিনি ইশকের ক্রেতা।

কেননা সৌন্দর্য্যের অধিকারী আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব সত্তাগত দৃষ্টিকোণে নয় বরং স্বীয় সৌন্দর্য্যের দর্শনের দৃষ্টিতে। অতএব, এই ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে নিজের সাথেই বন্ধুত্ব রাখেন, অন্যের সাথে নয়। মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি উক্ত আয়াত দ্বারা ফরজ আমল ও নফল আমল দ্বারা নৈকট্য লাভের বাস্তবতাকেও বুঝে নিতে পারেন। মূলতঃ খোদা সন্ধানীর কাছে সাহায্যকারী বন্ধুর তওফিক ও সাহায্যকারী বন্ধুর ব্যবস্থা হয় এবং 'আলাস্তু' এর স্বীকারোক্তির তারকা তার মুখমণ্ডলের উপর উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে।

পংক্তি

কিন্তু ইশকের সুগন্ধি তোমাকে মাতাল করল,
তোমার আলাস্তু অঙ্গিকার তোমাকে ইশকের সন্ধানী বানাল।

আর যখন সৌভাগ্যের সূর্য 'তিনি তাদেরকে ভালাবাসেন' এই আয়াতংশের মর্মের উদয়স্থল পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তখন আকস্মাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অভিভাবকত্ব এবং তাঁর বাদশাহী রহমতের সহায়তায় তাকে (বান্দা) কোন পীরে মুকাম্মিল (পূর্ণতাদানকারী পীর) ও পূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করেন। তখন তাঁর (মুর্শিদে কামিল) প্রেরণা উদ্দিপ্ত সাহায্য দ্বারা খোদা অনুসন্ধানীর বাদশাহ নফ্‌সে মুতমায়িন্না (প্রশান্ত চিত্ত) সম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে যায় এবং স্বীয় চারটি উপাদান-পানি, আগুন, মাটি ও বায়ুকে ভারসাম্যের উপর স্থাপন করে ব্যবস্থাপক মন্ত্রী নজীরহীন সমুজ্জল আকলকে (বিবেক) মন্ত্রণালয়ের দোয়াত-কলম অর্পন করে সুদৃঢ় তাগাদা ও মাত্রাতিরিক্ত উপদেশ প্রদান করেন যে, আমাদের সাম্রাজ্যের আবাদী, প্রজাদের অবস্থার উন্নয়ন, দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণ ও কোষাগারের ধন সম্পদ সমৃদ্বশালী করতে সর্বদা সচেতন থাকা এবং বাদশাহ নফ্‌সে আম্মারার প্ররোচনা দানকারী গুপ্তচর সমূহকে আমাদের সাম্রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করতে না দেয়া, প্রতি মুহুর্তে শিরার বৈদ্যুতিক তার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের সংবাদ নিতে থাকা, অতঃপর উক্ত শিরার প্রবাহিত নদী দ্বারা সমস্ত শহর পর্যন্ত সতেজতা পৌঁছিয়ে বসন্ত ঋতুর স্মরণকারী বন্ধু দ্বারা ইশক ও প্রতিপালকের ভালবাসার চত্বরকে চিরস্থায়ী বসন্তের বাগান বানিয়ে রাখা, কেরামান কাতেবীন-এর কোষাগারকে উম্মুক্ত সৌন্দর্য দর্শনের পুষ্প দ্বারা প্রতিমূহুর্তে সমৃদ্ধশালী ও আবাদ রাখা। তখন মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সমুজ্বল আকল সুন্দর সহযোগীতামূলক চিন্তাভাবনা, রক্ষাকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী চোখ, নাক, কান, হাত, জিহবা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা মেষপালের মালিক, প্রহরী, কোতোয়াল, দ্বাররক্ষী ও সিপাহীদেরকে বড় তাগিদ সহকারে সচেতন করতে থাকে। সেই সময় সমস্ত প্রজাগণ নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম মতে প্রতি মুহুর্তে প্রশান্ত হয়ে প্রকৃত বন্ধুর স্মরণে ধন-সম্পদ ব্যয় এবং প্রকৃত বন্ধুর বন্ধুত্বের হক পূর্ণ করতে সরগরম থাকে। আল্লাহ ইরশাদ করেন "জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণে অন্তর সমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরা রাদ)। আর নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য মতে প্রতি নিঃশ্বাসে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হযরত আলাস্তু'র সৌন্দর্য দর্শনের আলোচনায় মত্ত থাকে। আল্লাহ্‌র বাণী "যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।"(সূরা নুরঃ ৩৭)।

নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদে ধনশালী হতে থাকে। আল্লাহ্‌র বাণী, "কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।" (সূরা সেজদাহঃ ১৭)। আর মিলনের শরাবের সম্পৃক্ততা দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী পরিপূর্ণ ও সফলকাম হয়।

আল্লাহ্‌র বাণী-"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা আল্ কিয়ামাহ: ২২-২৩)। এবং রাতদিন বন্ধুর সাক্ষাতের সৌভাগ্যে সিক্ত থাকে। আর চিরস্থায়ীভাবে নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী উত্তম গুণের অধিকারী হয়। আল্লাহ্‌র বাণী-"তা হলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। এটা হল আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।" (সূরা নিসা: ৬৯-৭০)। হযরত হাফিজ শামসুদ্দিন বুলবুল সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

জান্নাতের বাগান হল দরবেশদের আস্তানা,
বুজুর্গীর পূঁজি দরবেশদের সেবা করার মধ্যে নিহিত।

তোমার তো এই ধারণা যে, বেহশত আসমানের উপর অবস্থিত। নয়! নয়! বেহেশত হযরত বুজুর্গদের আস্তানা পাকে অবস্থিত। তোমরা এটা মনে কর যে, পরকালে বেহেশতে প্রবেশ মৃত্যুর পর ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! দুনিয়াবী জগতে নফ্‌সের মৃত্যু ও ক্বিয়ামতের পর তা হবে। আর ইহা প্রেমিকদের ইশকের জন্য একটি কারামত (সম্মান)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ ও সমস্ত দানের উপর। হে আল্লাহ! দরূদ প্রেরণ করুন আপনার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী ও তাঁর উম্মতের আউলিয়াদের উপর। আর সালাম প্রেরণ করুন।

পঞ্চম ফরতুঃ পীরে কামিল অনুসন্ধানের বর্ণনা প্রসঙ্গে

হে প্রিয় বন্ধুগণ! যখন খোদায়ী সাহায্যের তাওফিক হবে এবং পীরের সান্নিধ্য অনুসন্ধানের আগ্রহ হবে, তখন প্রথমে নিজেকে ধোঁকাবাজ ও ভণ্ড পীরদের থেকে বাঁচাও। কখনও কোন সময় তাদের ধোঁকা ও প্রতারণা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ট কাফেরের আনুগত্য করবেন না।" (সূরা দাহরঃ ২৪)। এবং আল্লাহ ইরশাদ করেন,"যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।" (সূরা কাহাফঃ ২৮)। ভণ্ড পীরগণ দরবেশীর (ফকিরি) দাবি করে এবং মর্মার্থ সম্পর্কে খবর রাখে না। আর খোদা অনুসন্ধানীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে খোদার রঙ্গে রঙ্গিন করতে পারে না। তারা শিকারী পাখির মত শিস দেয়। এতে মোরগ ধোঁকা খেয়ে ফাঁদে ফেঁসে যায়। মোরগ মনে করে যে, এই আওয়াজটি আমাদের জাতির কারো। অনুরূপভাবে, তারা বাকপটু। তারা হালের অধিকারী সুফিয়ায়ে কেরামদের কথাবার্তাকে চুরি করে বর্ণনা করে। সুস্থ মেজাজের লোকদেরকে বিপথে চালিত করে। অনেক ইবলিশ শয়তানের গোপন ধোঁকাবাজি মানব ছুরতে হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত আয়াতটি সুস্পষ্ট দলিল- "তারা জিন ও মানুষের মধ্য থেকে" (সূরা নাস)। এই সমস্ত লোকদের হাতে হাত রাখা, তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করা এবং নিসবত ও সম্পর্ক সৃষ্টি করা দ্বীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং উভয় জাহানে ধ্বংসের কারণ। আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন–

মসনবী

যেহেতু আদমরূপী অনেক শয়তান আছে,
তাই প্রত্যেক হাতে তোমার হাত রাখা উচিত নয়।
কারণ শিকারী শিস দেয়,
যাতে সে পাখিকে তার ফাঁদে ঘায়েল করতে পারে।
কপট ব্যক্তি দরবেশদের কথা চুরি করে,
যাতে সে সহজ সরল মানুষের কাছে তা মন্ত্রবৎ পড়তে পারে।

দুনিয়াবাসী অসম্পূর্ণ আকল (বিবেক) এর কারণে দুনিয়ার ধোঁকাবাজদেরকে আউলিয়া মনে করে। দুনিয়াবাসী নিজেই উদাসীন। সেই জন্য উদাসীনদের দিকে মনোযোগী ও ঝোঁক প্রবণ। আল্লাহ ইরশাদ করেন," দূশ্চরিত্রা নারীকূল দূশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে।" (সূরা নুরঃ ২৬)।

ভণ্ডপীরগণ সোবহে কাযিব (কপট প্রভাত) এর অনুরূপ। কেননা তারা আলো মনে করে কাফেলা যাত্রা করে, অতঃপর অন্ধকারে ডাকাতদের হাতে মৃত্যুবরণ করে। হযরত রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

দুনিয়াদারদের জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্পূর্ণ,
তাই তারা এটিকে (ধোঁকাবাজি) সুবহে সাদিক (সত্য প্রভাত) মনে করেছিল।
সুবহে কাযিবে (কপট ভোর) কাফেলা যাত্রা করেছে,
এই আশায় যে দিনের আলো প্রস্ফুটিত হবে।
সুবহে কাযিব (কপট প্রভাত) মানুষের পথ প্রদর্শক যেন না হয়,
কেননা ইহা অনেক কাফেলাকে ধ্বংসের বাতাসে পর্যুদস্ত করে দেয়।
হে কপট ভোরে বন্দি তুমি!
সুবহে সাদিককে তুমি মিথ্যা মনে করো না।

ভণ্ডপীরগণ আ'রেফদের (আল্লাহওয়ালা) কথাশুনে তোতা পাখির মত মুতারজম (দোভাষী) হয়ে থাকে, কিন্তু উহার মর্মার্থ সম্পর্কে খবর রাখে না। ভণ্ড পীরগণ যদিও প্রাথমিক অবস্থায় সবার কাছে গ্রহণীয় হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়।

পংক্তি আকারে গল্প

একদা নব্বই বছরের এক অতিশয় বৃদ্ধ ছিল,
তার মুখে জাফরানের রং মাখা ছিল।
মলদ্বারের মত তার মুখ ছিল মিলিত,
কিন্তু তার শখ হল বর হওয়ার।
তার মুখের দাঁড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং দাঁতও পড়ে গিয়েছিল,
তার দেহের উচ্চতা ও অনুভূতির মূলে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।
কিন্তু বর হওয়ার বাসনা তার পরিপূর্ণ ছিল,
সে শিকার খুঁজছিল কিন্তু তার ভাগ্য ছিল মন্দ।
তার ছিল না আকর্ষণ, ছিল না সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের ঝোঁক,
তার মুখ থেকে পিয়াজের মত নোংরা গন্ধ বের হচ্ছিল।
তার প্রতিবেশীর মধ্যে তার বিয়ের ব্যপারে আশ্চর্যজনক কৌতুহল সৃষ্টি হল,
ঘটনাক্রমে তারা তাকে তালাশ করল।
তার পয়গাম নিয়ে যখন যে গেল,
সে তার মুখের সামনে আয়না রাখল।
সে চুল, ভ্রুগুলিকে পরিস্কার করছিল,
যাতে সাজ-সজ্জা দ্বারা তার মুখের আলো ছড়ায়।

সে অহমিকা বশতঃ গোলাপী রঙ মাখল-আর চাদর পরিধান করল।
কুরআনের গিলাফ সে বিক্ষিপ্তভাবে কেটে মুখে কম বেশি বাঁধল।
চাদর পরেছিল যাতে তার নগ্ন গলাকে সুন্দর দেখায়।
কুরআনের গিলাফ যখন সে তার মুখে বাঁধল,
এতে তার চাদর উড়ছিল এবং সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল।
অতএব, সে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই কাপড়গুলোকে নিজের মুখে বাঁধল।
অতঃপর সে উক্ত চাদরকে খুশিতে গুছিয়ে নেয়,
এতে কাপড় মুখ থেকে মাটিতে পড়ে যায়।
শেষ পর্যন্ত সমস্ত কলা কৌশল প্রয়োগে সে অক্ষম হল,
সে বলল, শয়তানের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।
অতঃপর সেখানে ইবলিশ ছদ্মবেশ ধারণ করে উপস্থিত হল,
এবং বলল, হে বদমায়েশ ও জগতের ধোঁকাবাজ!
আমি সারা জীবনে এটা চিন্তা করি নাই,
তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে এই ধোঁকাবাজি দেখি নাই।
তুমি কেলেঙ্কারিতে আশ্চর্য বীজ বপন করেছ,
এ ক্ষেত্রে তুমি কুরআনকেও ছাড় দাওনি।
ধোঁকাবাজিতে ইবলিশ তোমার আরো অনেক পিছিয়ে,
হে বুড়ো সম্রাট! আমাকে ছেড়ে দাও।
চুরি করেছ কুরআনের গিলাফ,
যাতে তোমার মুখ আপেলের মত রঙিন দেখায়।
চুরি করেছ তুমি খোদার আউলিয়াদের কথা-বার্তা,
যাতে তা বিক্রি করে সবার কাছে থেকে মারহাবা (অভিনন্দন) পাও।
রঙ লাগিয়েও গোলাপী রঙ ধারণ করতে পারনি,
কথায় চাতুরি করেও মোহিত করতে পারনি।
যদিও খোদার আউলিয়াদের কাছ থেকে গুপ্ত রহস্য চুরি করে
এই বৃদ্ধ লোকের মত রঙ্গিন দেখায়।
কিন্তু এই ধার করা রঙ কতক্ষণ থাকবে?
শেষ পর্যন্ত হঠাৎ আসবে দুর্নাম ও কলঙ্ক।
যদিও সে প্রথম দিকে সবার কাছে গৃহীত হয়,
কিন্তু পরবর্তীতে সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হয়।

কামালিয়ত (পূর্ণতা) এর সম্পদ অর্জন কামিল মুর্শিদের শুভ দৃষ্টি ব্যতিত সম্ভব নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম

হও।" (সূরা মায়েদা: ৩৫)। এই আয়াতটি অবশ্যই পালনীয় আল্লাহর বাণী। যার পীর মুর্শিদ কামিল নয়, সে উভয়ের জাহানে ধ্বংসের সম্মুখীন। নিম্নোক্ত হাদিসটি ইহার উপর স্পষ্ট প্রমাণ "যার পীর নাই, তার পীর শয়তান"।

কবিতা

আল্লাহর অনুগ্রহ ও খাস মেহেরবানী ব্যতিত যদি ফেরেশতাও হয়,
তাহলে তার আমলনামা অন্ধকার থাকবে।

তাফসীর ইবনে আরবীতে আছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী-"আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদেরকে গায়েবের সংবাদ দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। অর্থাৎ যে হাক্বিকত ও গোপনীয় অবস্থাদি তোমাদের অস্তিত্বে লুকায়িত আছে, তোমাদের মাঝে ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকার কারণে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উক্ত কামালাত (পূর্ণতা) সমূহ অর্জনের যোগ্যতা না থাকার কারণে কাউকে তিনি (আল্লাহ) সেই বিষয়ে (গায়েব) অবহিত করেন না। "কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে স্বীয় রহস্যাদি অবহিত করেন। আর হাকিকত ও প্রকৃত অবস্থাদি সমূহ তাঁর কাছে উম্মুক্ত করে দেন যাতে একই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার কারণে তোমাদেরকে গোপন রহস্যপূর্ণ ধন ও তোমাদের অস্তিত্বের দিকে হেদায়ত করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। অর্থাৎ অতএব তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন।"বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপন কর" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। অর্থাৎ যদি বিচার বিশ্লেষণ করে ঈমান আন এবং ইয়াকীন (দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান) এর দিকে চলতে থাক এবং তরিকার অনুসরণ কর। "পরহেজগারী অবলম্বন কর।"(সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। অর্থাৎ তোমরা যদি নফ্‌সের হিজাব (অন্তরায়) ও সুলুকের পথের অন্তরায় থেকে বাঁচ।"তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯)। অর্থাৎ অতএব তোমাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। তোমাদের কাছে মূল হাকিকত উম্মুক্ত হয়ে যাবে।

'মগজুল মা'আনি' গ্রন্থে হযরত কুদওয়াতুল কামেলীন যুবদাতুল আরেফিন মাখদুম শাহ শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনিরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, তরিকতের শায়েখদের ঐক্যমত্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তরিকতের বিপদসংকূল পথে কামিল পীর অনুসন্ধান করা ফরজ। যাঁদেরকে দেখে সুদৃঢ় অবস্থা অর্জন, আল্লাহ্‌র জালালিয়ত (মহিমা) এর গৌরব, তাঁর জামালিয়ত (সৌন্দর্য) এর ব্যাপকতা ও সুক্ষ্মতা মন্থন করা যায় এবং যাঁদের ব্যাপারে

নিম্নোক্ত হাদিসের মর্ম বাণী সঠিক বলে প্রযোজ্য হয়- "আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস"। আর তাঁরা মুরিদদের অন্তরের সমস্ত রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং উক্ত রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞ ও দক্ষ। সমস্ত মাশায়েখগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) আল্লাহ্‌র দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মকবুল (গৃহিত)। তাঁদের সাহায্য ব্যতীত কেউ খোদার বিশেষ সীমারেখা বা অঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া, এই চলার পথটি অত্যন্ত বিপদসংকুল ও অত্যন্ত কঠিন। এই পথে ধ্বংসের কারণ অনেক। কেননা, কোন বেলায়তের অধিকারী শায়খের আশ্রয় ব্যতীত উক্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা অসম্ভব।

কবিতাংশ

পথে ভয়ে ভরা, কেননা চোর ওঁৎ পেতে বসে আছে।

কবিতাংশ

প্রেমের পথে প্রবাহিত মৃদুমন্দ বাতাস থাকে না,
পথের প্রতিটি মুখে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা, এই পথ সহজ নয়।
পথে পথে রয়েছে অনেক অজগর সাপ, মানুষ খেঁকো সিংহ ও নেকড়ে বাঘ,
ইশকের পথ কন্টকাকীর্ণ এবং ইশকের এই বৈঠক আরামদায়ক নয়।

এতদ্ব্যতিত মুর্শিদে কামেলের সামান্য শুভ দৃষ্টি দ্বারা স্বল্প সময়ে এমন নেয়ামত ও পূর্ণতা অর্জিত হয় ; যা বছরের পর বছর পরিশ্রম ও রেয়াজত দ্বারা অর্জিত হয় না। কেউ সুন্দর বলেছেন-

পংক্তি

যখন তিবরিজ শামসুদ্দিন এর প্রতি একটি শুভ দৃষ্টি দান করলেন,
তখন তিরস্কার হয়ে গেল প্রশংসা, ঠাট্টা হয়ে গেল বাহ্ বাহ্!

'ইরশাদুত্তালেবীন' গ্রন্থে কাজি ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, তরিকতের রাস্তা অনুসন্ধান ও বাতেনী পূর্ণতা অর্জন খোদার বাণীর মর্ম অনুযায়ী পালনীয় কর্তব্য ও ফরজ। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক।"(সূরা আলে ইমরানঃ ১০২)। কেননা, পূর্ণ তাকওয়া অর্জন তিন প্রকার ফানা (বিনাশ) যথাঃ ফানায়ে খাল্ক (পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন), ফানায়ে হাওয়া (অনর্থ পরিহার) ও ফানায়ে এরাদা (নিজ ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন); যেগুলো বেলায়ত অজর্নের বিষয়বস্তু, তা ব্যতীত কখনও কল্পনা করা যায় না। এমন কি যেই ব্যক্তির উক্ত ইলমে বাতেনীর (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) অংশ জুটে না, তার শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার শংকা থাকে (উহা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি)। আর এই ফরজ হওয়ার বিষয়টি শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং এতে মহিলারাও অন্তর্ভূক্ত।

যদিও 'আমিনু' (তোমরা ঈমান গ্রহণ কর) ও 'ওয়াত্তাকু' (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর) শব্দদ্বয় অধিকাংশ স্থানে পুরুষবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ কুরআন ও হাদিসে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি বিধিবদ্ধ। আমাদের দেশের পশুবৎ সাধারণ লোক বরং নামধারী মুর্খ আলেমগণের বিশ্বাসের মধ্যে এই ত্রুটি দেখা যায় যে, মহিলাগণ ফকির (অলি) হয় না। আর আল্লাহ্‌র মা'রেফাত ও কামালিয়ত রূপী সম্পদ অর্জন করা তাদের জন্য অসম্ভব। সুবহান আল্লাহ (আল্লাহ কতই পবিত্র)! কি মুর্খতার কথা? আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী, "আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়া)। উক্ত আয়াতে তাফসীরকারক আলেমদের ঐক্যমত্যে 'ইবাদত' দ্বারা মা'রেফাত উদ্দেশ্য । অর্থাৎ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরফান (খোদা পরিচিতি জ্ঞান) অর্জন করা। চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, উক্ত মা'রেফতের সম্পদ অর্জন করা সবার উপর ফরজ। অথচ انس 'ইনস' শব্দটি আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে পুরুষদের সাথে নিদিষ্টি নয়। অতএব, যারা উক্ত শব্দটিকে (ইনস) পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে, তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজিদের অর্থগত বিকৃত ঘটায় অথবা আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যারোপ করে। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা উহা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মওলানা জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'নফহাতুল ইনস' গ্রন্থে রেজালুল্লাহ (আল্লাহ্‌র পুরুষ অলিগণ) এর স্তর সমূহের অবস্থা বর্ণনার পর বলেন, 'ঐ সমস্ত মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁরা আল্লাহ্‌র মা'রেফাত অর্জনকারী এবং পুরুষ অলিগণের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন'। উক্ত বক্তব্যের পর উক্ত মওলানা (মওলানা জামি) প্রমাণ উপস্থাপনের খাতিরে 'ফতুহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থকার হযরত শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বাণী 'ফতুহাতে মক্কীয়া' থেকে বর্ণনা করে বলেন- যার অনুবাদ হল এই যে, 'ফতুহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থকার 'ফতুহাত' গ্রন্থের ৭৩ তম অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র অলিদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের স্তর বর্ণনা করার পর বলেন, 'ঐ সমস্ত খোদার বান্দাগণ যারা পুরুষ, যাদেরকে রিজাল (পুরুষ) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কতেক মহিলাও রয়েছেন'। কিন্তু পুরুষ আউলিয়াদের আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং কতেকের ব্যাপারে তাঁর থেকে জিজ্ঞসা করা হল যে, আবদাল কতজন? তিনি উত্তর দিলেন, চল্লিশ জন, তাঁকে বলা হল- কেন চল্লিশ জন পুরুষ বলা হয় না? তিনি (ইবনে আরবী) উত্তর দিলেন, তাঁদের মধ্যে মহিলাও রয়েছেন। 'তাবকাতে মাশায়েখ' গ্রন্থকার শায়খ আব্দুর রহমান সালামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) আবেদা (ইবাদত গুজারকারী মহিলা) ও আরেফাদের (খোদা

তত্ত্বজ্ঞানী মহিলা) অবস্থাদির আলোচনা উক্ত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের ব্যাপারে কতেক বুজুর্গ বলেন,

পংক্তি

"সূর্যের নামের ক্ষেত্রে স্ত্রী লিঙ্গ হওয়াটা দোষের নয়,
আর চন্দ্রের নামের ক্ষেত্রে পুং লিঙ্গ হওয়াটা গর্বের কোন বিষয় নয়"।

হযরত মওলানা জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'নফহাতুল ইনস' গ্রন্থে অনেক মহিলাদের উল্লেখ করেছেন। বিচার্য বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের জন্য জীবন-মৃত্যু, কবরের আযাব, হাশর, হিসাব-নিকাশ, কিতাব (কুরআন) ও পুলসিরাত সবকিছু রেখেছেন। যদি উক্ত বিপদাপদ ও সমস্যাদি থেকে বাঁচার উপায় ও কলাকৌশল তাদের (মহিলা) জন্য হারাম করে থাকেন, তাহলে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুলুম। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যুলুম করার ইচ্ছা করেন না।" (সূরা মুমিন)।

অতএব যুলুমের ত্রুটি থেকে আল্লাহ পবিত্র। অবশ্যই, মা'রেফত এর সম্পদ অর্জন মহিলাদের উপর ফরজ। ইহা ব্যতিত উক্ত বিপদ সমূহ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। আর এই স্তরে একটি অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ছদ্মবেশি আলেম ও চরিত্রগতভাবে মুর্খ ব্যক্তি ফাসেদ (ত্রুটিপূর্ণ) চিন্তা চেতনায় মগ্ন হয়ে বলে যে, উম্মী, অশিক্ষিত ও জ্ঞানহীন ব্যক্তিবর্গ খোদাকে চেনে না এবং মা'রেফতের সম্পদে সমৃদ্ধ হয় না । তারা হযরত শায়খ সাদী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর নিম্নোক্ত পংক্তিটি প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন-

পংক্তি

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মোমের মত গলে যেতে হয়,
কেননা জ্ঞানহীন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারে না।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন জেনে রাখ যে, মা'রেফাত ও ইরফান (খোদা পরিচিতি জ্ঞান) ঈমানের সোপানে আরোহন বুঝায় এবং বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের প্রাথমিক ফরজ। আর বিশ্বাস স্থাপন অর্থ এই নয় যে, একবার ময়না ও তোতা পাখির মত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' কলমাটিকে নিজের মুখের গানের সুর বানাবে এবং উহার নিয়ম কানুন ও উন্নতির সোপান সম্পর্কে পরিপূর্ণ হাত গুটিয়ে রাখবে। না, ইহা কখনো হতে পারে না। বরং নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক সমগ্র জীবন কালব্যাপী ঈমানের স্তর সমূহের উন্নতির অনুসন্ধানে লেগে থাকা সবার উপর আবশ্যকীয় ফরজ। আল্লাহ্‌র বাণী-"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ঈমান গ্রহণ কর।" আর নিম্নোক্ত

আয়াত-"আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" এই আয়াতেও মা'রেফত ও ইরফানকে কোথাও আলেমেদের জন্য খাস (নির্দিষ্ট) বলা হয়নি। যদি উম্মী ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ইরফান ও মা'রিফতের সম্পদ অর্জন হওয়া অসম্ভব ধরা হয়। ইহা দ্বারা এই কথা আবশ্যক হয় যে, শুধু মাত্র আলেম (জ্ঞানী) ব্যক্তি উক্ত সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বেহেশতে যাবে এবং এই বেচারা উম্মী ব্যক্তিগণ দোযখ ছাড়া বেহেশতের মুখ পর্যন্ত দেখবে না। আর নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুম মতে- "যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত" (সূরা বনি ইসরাইলঃ ৭২)। এই লোকেরা (নিরক্ষর) খোদার দিদার (সাক্ষাত) থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। বরং উক্ত বাণীর মর্ম দাঁড়ায় এই যে, নিরক্ষর লোকেরা ঈমানের নিয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হবে না। কেমন ভাল পথপ্রদর্শক যে, নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে ঈমানের নিয়ামত দ্বারা হস্ত মর্দন করে। উহা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কুরআন হাদিসের কোথাও ইহা আসেনাই যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা খোদাকে চিনতে পারে না। ঠিক ঠাক চিন্তা কর ও খেয়াল কর যে, দুনিয়াতে কোন মানব মায়ের পেট থেকে আলেম (জ্ঞানী) হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। যখন ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক সীমায় উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্‌র আমানতের দায়দায়িত্ব, যাকে আল্লাহ্‌র বাণী অনুযায়ী "আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম।" (সূরা আহযাবঃ ৭২)। উক্ত বাণীর মর্ম অনুযায়ী আকাশ ও পৃথিবী উক্ত দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম হয়ে গেল। উক্ত হালকা মাটিস্থ মানবের মাথার উপর ঐ দায়িত্ব অপর্ন করা হয়। বুলবুল সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

আসমান আমানতের ভার (তৌহিদের আমানত) গ্রহণে সক্ষম হয়নি,
কিন্তু আমার নামের ভাগ্যের লটারীতে মানব পাগল হয়ে গেল।

"আর প্রত্যেক নর-নারীর উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ" এই হাদিসের হুকুম অনুযায়ী উক্ত দায়িত্বকে সহজে পালনের নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণ; যাকে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র মা'রিফতের ব্যপারে আবশ্যক, তা অর্জন করা ফরজ। আর এই জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথমটি হল- শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দ্বিতীয় প্রকার হল- তরিকতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। যেমন ঈমান সংশ্লিষ্ট আক্বিদা সমূহ সুদৃঢ় করার পর শরীয়তের জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ইসলামের বাহ্যিক বিষয়। যেমন ফরজ সমূহ, ওয়াজিব সমূহ, সুন্নাত সমূহ, মোস্তাহাব সমূহ, হারাম-হালাল, মাকরূহ ও মোবাহ; যেগুলোকে ফিকহ বলা হয়। এই

জ্ঞানগুলো যাহের শরীয়তের আলেমদের বরকতময় খেদমতে গিয়ে শিক্ষা করা ফরজ। সেইরূপ তরিকতের জরুরী বিধানাবলীর জ্ঞানও; যাকে ইসলামের অভ্যন্তরীন বিষয় বলা হয় এবং উহাকে তাসাউফ বলা হয়। উক্ত জ্ঞান তরিকতের আলেমদের ফয়জপূর্ণ খেদমতে গিয়ে অর্জন করা ফরজ। উক্ত তিন প্রকার ইলম (জ্ঞান) ব্যতিত ইসলাম পূর্ণ হয় না। আর "জ্ঞান অন্বেষণ ফরজ।" এই হাদিসে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা মানতিক, হিকমত, দর্শন ও ইত্যাদি শাস্ত্রগুলো উদ্দেশ্য নয়। বরং ঐ শাস্ত্রগুলো উদ্দেশ্য যা ঈমান ও ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য আবশ্যক। তাই 'মুসলিম পুরুষ' ও 'মুসলিম নারী' উভয়ের প্রতি উক্ত হাদিস পরিপূর্ণ ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ বাহ্যিক শরীয়তের বিধানবলীর জ্ঞান অন্বেষণ এবং আভ্যন্তরীন ইসলাম তথা তরিকতের জ্ঞান, যা ইসলামের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক, তা সকল পুরুষ, নারী, যুবক ও বৃদ্ধের উপর পরিপূর্ণ ফরজ। সেই কারণে হাদিসে 'মুসলিম পুরুষ' ও 'মুসলিম নারী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'সকল মানুষ' ও অন্যান্য শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় নাই। সেই কারণে ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করল এবং ফিকহ শিখল না, সেই যিন্দিক (ধর্মহীন)। আর যে ব্যক্তি ফিকহ শিখল এবং তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করল না, সেই ফাসিক (পাপী)। আর যে ব্যক্তি উভয়টি শিখল, সে মুহাক্কিক (সত্য অনুসন্ধানকারী)। কেননা উক্ত তিনটি বিষয় একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। তাই এই বিষয়টি 'লুমআ' (চমক) পর্বের চতুর্থ ফরতু (রশ্মি) এ বর্ণনা করেছি।

তাছাড়া আলেমগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) উক্ত হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'দলীলুল আরেফিন' গ্রন্থে উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন- "'ইলম' (জ্ঞান) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মা'রেফাতের জ্ঞান। কেননা ইহা পরিত্রাণ ও নৈকট্য অর্জনের কারণ। অতএব, উহা শিক্ষা করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। আর উহা ফিকহ ও তাসাউফের জ্ঞান ব্যতীত পূর্ণ হয় না। হযরত মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর কিতাব 'যাদুত্তাকওয়া' ও অন্যান্য কিতাব দ্বারা বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট। শায়খ সাদী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর বাণী-

পংক্তি

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মোমের মত গলে যেতে হয়,
কেননা জ্ঞানহীন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারে না।

উক্ত শে'রে 'ইলম' দ্বারা ঈমানের বিধি বিধান সংক্রান্ত আবশ্যকীয় জ্ঞান উদ্দেশ্য। শরীয়ত ও তরিকতের বিধানাবলীর জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহ্‌র পরিচিত

লাভ করা যায় না। চাই, এই জ্ঞান বড় বড় কিতাব অধ্যায়ন করে অর্জন করা হোক। চাই, কোন জ্ঞানী মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তির শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা হোক। তাই হযরত শায়খ আকবর নিম্নোক্ত আয়াত এর- "এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর।" (সূরা কাহাফ: ১৯)-তাফসিরে বলেন, সবার কামালিয়ত (পূর্ণতা) শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং শ্রেষ্ঠ কামালিয়ত হল- ঐ জ্ঞানের পূর্ণতাকে বলা হয়। অতএব, প্রত্যেক দল থেকে কতেককে শিক্ষা দান এবং কতেককে সতর্ক করা দ্বারা অন্যের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-"তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না। যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা তাওবা: ১২২)। অথবা উক্ত শে'রে 'ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইলমে ফানা (নিজেকে খোদার মধ্যে বিলীন করার জ্ঞান)। কেননা, বরকত ও ফয়জ কামিল পীরের সাহচর্য্য দ্বারা অর্জিত হয়। কিতাব অধ্যায়ন দ্বারা তা অর্জিত হয় না। তাই উক্ত শে'রের ১ম পংক্তিতে گداخت (গলে যাওয়া/বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া) শব্দটি (গাদাখত) এবং 'পতঙ্গ' ও 'মোমবাতি' শব্দদ্বয় দ্বারা উপমা প্রদান উহার দিকে ইঙ্গিতবহ। তাছাড়া রাসুল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অধিকাংশ সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উম্মী ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সাহচর্য্যের কারণে তাঁদের ঐ মা'রিফাত অর্জন হয়েছে যে, বড় আউলিয়া কেরামদের মধ্য থেকে কেউ একজন নিম্ন স্তরের সাহাবীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্তরে পৌঁছতে পারেন না। তাছাড়া অধিকাংশ আউলিয়া কেরাম 'হাবীবে আজমী' ও অন্যান্য আউলিয়ার মত উম্মী। কামিল মুর্শিদের ছোহবতের (সাহচর্য) কারণে তাঁরা বেলায়তের স্তরে উপনীত হয়েছেন এবং মা'রেফতের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছেন। অতএব, উক্ত আলোচনা থেকে তোমাদের কাছে খুব সুস্পষ্ট হল যে, শরীয়তের ও তরিকতের আবশ্যকীয় জ্ঞান অনুসন্ধান মা'রেফতের জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত; যা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবার উপর ফরজ। আর উহা কামিল মুর্শিদের ছোহবতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর গাধার মত কিতাবের বোঝা বহন করার প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন-"যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে।" (সূরা জুমুআহ: ৫)।

অতএব যাঁর ছোহবত বা সাহচর্য্যে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধানবলীর জ্ঞান অর্জন করে, মানুষের পরিভাষায় তাঁকে শিক্ষক ও ওস্তাদ বলা হয়। আর

যাঁর সাহচর্য্যে তরিকতের বিধানাবলীর জ্ঞানের নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া যায় তাঁকে পীর ও মুর্শিদ শব্দ দ্বারা ব্যাখা করা হয়। এখন জেনে রাখ যে, বেলায়তের সম্পদ অর্জন যেটি জজ্‌বা (আকর্ষণ) এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবার আল্লাহ্‌র আকর্ষণ কখনও মাধ্যমবিহীনও হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাকে স্বীয় একমাত্র রহমত ও দয়া বর্ষণ দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেন এবং কোন পীরে কামিল এর মাধ্যম ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে স্বীয় নৈকট্যের নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করেন। এইরূপ ব্যক্তিকে সুলুকের পরিভাষায় اویسیہ(উবসি) এবং মুজতাবা বলা হয়। আর ইহা অত্যন্ত বিরল। লক্ষ কোটির মধ্যে অল্প কারো ভাগ্যে জুটে। আল্লাহর বাণী-"উহা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে দান করেন"(সূরা জুমুআ)। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ জজ্‌বা (খোদায়ী আকর্ষণ) মাধ্যম ও অসিলার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি (আরোহী যুক্তি পদ্ধতি) অনুযায়ী ঐ মাধ্যম এই দুইটি বিষয় হতে অতিরিক্ত নয়- তা'হল প্রথমটি ইবাদত ও রিয়াজত এবং দ্বিতীয়টি কামিল পীরের সাহচর্য্য। অতএব, যেই জজ্‌বা ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয় উহাকে ইবাদতের ফলাফল বলা হয় এবং ইবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন বলা হয়। আর যেই জজ্‌বা ইনসানে কামেল (পূর্ণমানবতা প্রাপ্ত পীর) এর সাহচর্য্যের বরকতে অর্জিত হয়, উহাকে শায়খে কামিল এর প্রভাব অথবা ফয়জ অথবা তাওয়াজ্জুহ নামকরণ করা হয়। কামিল পীর যতজন আছেন সবাই আসহাব ও মকামের অধিকারী। আর হাল ও মকামের অধিকারী হওয়া দয়ালু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দান। প্রচেষ্টা প্রসূত হাল ও মকাম অর্জনের ক্ষেত্রে মূলত এতে কোন দখল নেই। প্রত্যেক হযরত কামিল পীরগণ মুরিদ ছিলেন এবং মুরিদির প্রত্যেক স্তর সততা ও সাগ্রহে অতিক্রম করেছেন। আর 'তালবিন' নামক স্তর অতিক্রম করে 'তমকিন' নামক স্তরে পৌঁছেছেন। উত্তাল নেশার অকূল দরিয়ায় ভেসেছেন। তাঁদের পবিত্রতা ঐ স্তরে পৌঁছেছে যে, কারো শক্তি নাই যে, তাদের ভাল কাজ সমূহকে দূর্বল বুদ্ধিমত্তার পাল্লায় পরিমাপ করবে। পর্বতের সাথে শুকনো ঘাসের কি সম্পর্ক? আসমানকে পাল্লা দ্বারা পরিমাপ করা নির্বুদ্ধিতা। তাঁদেরকে চেনার জন্য জিবরাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

পংক্তি

ঐ দিদার (দর্শন) এর জন্য পাগল প্রেমিকের চক্ষু থাকা উচিত।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তরিকতের মুফতিদের ফতওয়া হল যে, হাদিস- عن البحر لا حرج (সমুদ্র সম্পর্কে বর্ণনা কর, এতে কোন ক্ষতি নেই)[১]। যদিও অল্প চিনি ক্রয় করতে না পার, উহার মধু আহরণ থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়। এখন জেনে রাখ যে, তরিকতের সালেক হাকিকতের শরাব খানার শরাব পানকারীগণ চার প্রকার। প্রথম প্রকার হল 'মজজুবে সালেক'। দ্বিতীয় প্রকার হল 'মজজুব'। তৃতীয় প্রকার হল 'মজজুবে মহজ' এবং চতুর্থ প্রকার হল 'সালেকে মহজ'।

পূর্ববতী নবীদের উম্মতদের মধ্যে প্রত্যেক যুগে এক একজন নবী প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক গ্রামে প্রেরিত হতেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "এমন কোন সমপ্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।" (সূরা ফাতির: ২৪)। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদিস অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণণামতে নবীগণ (আলাইহিম আস্সালাম) এঁর সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা তার চেয়ে বেশি। তাঁদের মধ্য থেকে রাসূলদের সংখ্যা তিনশত তের জন। এক হাজার বছর বা এক হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী পয়গাম্বর প্রেরিত হতেন। তাই, হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর যুগের হাজার বছর পর হযরত নুহ (আলাইহিস্সালাম) জন্ম লাভ করেন। অনুরূপভাবে, তাঁর পর হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্সালাম) এবং তাঁর পর হযরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) ও হযরত ঈসা (আলাইহিস্সালাম) আগমন করেন। তাঁদের পর আমাদের নবী সরওয়ারে কায়েনাত আফজালুস সালাত ওয়া আকমালুত তাসলিমাত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরিত হন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেদায়তের নুর ও পথ প্রদর্শন দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করেন। নবুওতের যুগের পর উম্মতের আউলিয়াগণ ও আল্লাহওয়ালা আলেমগণ হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও খলিফা হিসেবে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা "আল্লাহওয়ালা আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ"।

মিশকাত শরীফে আছে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মতের দ্বীনকে তার

---

[১] এই হাদিসটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। পূর্ণ হাদিসটি হল- حدثوا عن البحر ولا حرج । এই হাদিসটি আরবি প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইহা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় (আল-ইয়ুসী, পৃ:-১০৩, খ:২, অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

জন্য সঞ্জীবিত করবেন (আবু দাউদ, হাদিস নং-৪২৯১)। কালের মাঝে যখন হাজার বছর বা হাজার বছরের কাছাকাছি বছর অতিক্রম হয়ে যায় তখন দৃঢ়প্রত্যয়ী সময় (প্রতিনিধি আবির্ভাবের সময়) চলে আসে। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী জগতকে সুদৃঢ়কারী একজন গাউসে জমান যুগ সংস্কারক মজজুবে সালেক হযরত রাসূলে করিম (দঃ) এর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) মাঝে প্রেরণ করেন। আর তাঁর হেদায়ত ও পথ প্রদর্শন দ্বারা সমগ্র জগতকে কদাকার অন্ধকারের অতল গহবর ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ দিয়ে ফেরেশতা বৈশিষ্ট্য ও রহমানী বৈশিষ্ট্যের আলোকছটা পৌঁছিয়ে থাকেন। খোদায়ী রহস্যের খনি হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন যে,

মসনবী

প্রথম স্তরে হলেন মজজুবে সালেক যিনি প্রথম জজ্বায় (আকর্ষণ) খোদার সাথে মিলন ঘটিয়ে দেন।

যাঁকে মনোনীত বান্দা হিসেবে সৃষ্টিকুলে কাছে আল্লাহ প্রেরণ করেন,
যাতে তিনি জগতের সৃষ্টিজীবকে পথ প্রদর্শন করতে পারেন।
বছরের পর বছর নভোমণ্ডল অনেক কান্নাকাটি করেছিল,
যাতে এই রকম একজন পীর জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বরকতপূর্ণ বিদ্যমানতা জগতবাসীর জন্য লাল গন্ধক স্বরূপ। মাটির মুষ্টিকে স্বর্ণে পরিণত করা তাঁর ফয়েজপূর্ণ শুভ দৃষ্টির প্রভাবজনিত বিষয়। হযরত আব্দুস সামাদ ওরফে শাহ রুনমিসত (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় মসনবী 'তোহফাতুল আশেকীন' এ লিখেন-

মসনবী

এখন শুন মজজুবে সালেকের বর্ণনা,
যাতে তোমার কাছে ভাল-মন্দ সব সুস্পষ্ট হয়ে যায়।
অর্থাৎ সায়ের (পরিভ্রমণ) এর যোগ্যতা সম্পন্ন ঐ মজ্জুবে সালেক,
হে বৎস! যার সাহচর্য্যে প্রথমে জজ্ব (খোদায়ী আকর্ষন) হাসিল হবে।
হে যুবক! তাঁর জজ্বের পর সুলুক এমন হবে যে,
খোদা ছাড়া সবার কাছে তিনি থাকবেন গুপ্ত।
হে সায়েরের অধিকারী! এমনকি তিনি থাকবেন গুপ্ত,
ফেরেশতাদের কাছেও তাঁর প্রকৃত অবগতি থাকবে না।
হে পূণ্যবান! এই জজ্ব হল চুড়ান্ত পর্যায়,
আর এই তরিকা সব তরিকা থেকে কঠিন।
তাঁর নির্দেশ মতে তিনি সবার সাথে রয়েছেন,

অতএব, যাতে কেউ যেন ইশকের সীমার বাইরে পা না রাখেন।
অর্থাৎ যেরূপ সৃষ্টি জীবের মধ্যে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক,
অনুরূপ আমার প্রাণের সাথে রয়েছে খোদার সম্পর্ক।
হে সম্মানিত! যার হবে এমন অবস্থা,
খারাপ সাহচর্য দ্বারা তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।
আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জরুরী ভিত্তিতে এ জন্য প্রেরণ করেছেন,
যাতে সৃষ্টি জীব তাঁর থেকে ফয়েজ লাভ করতে পারেন।
হে ধার্মিক পুরুষ! যাঁর এমন সুলুকিয়ত থাকবে,
তিনি ইশকের ফকির এবং নিশ্চিতভাবে বাদশাহ।
হে আল্লাহওয়ালা! তাঁর সাহচর্য্য দ্বারা জজ্‌বা সৃষ্টি হবে,
তোমার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা তৎক্ষণাৎ সত্যে পরিণত হবে।
আল্লাহ্‌র বাণী "নিশ্চয় আপনি যাকে চান হেদায়ত করতে পারেন না;
কিন্তু আল্লাহ যাকে চান পথ দেখান" (সূরা কাসাস)।
চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্খা (হেদায়ত পাওয়ার আকাঙ্খা) না থাকলে কোন
প্রভাব বিস্তার করে না (হেদায়ত পাওয়া যায় না),
এতদ্‌বিষয়ে তুমি নবীদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) হেদায়তের কর্মকাণ্ড সমূহের প্রতি
লক্ষ্য করে দেখ।
হে সুনামের অধিকারী! যখন তোমার কাছে খোদার জজ্‌বা আসবে অর্থাৎ
মুর্শিদের মাধ্যমে তোমার একনিষ্ঠতা পূর্ণতা লাভ করবে।
হে পূণ্যবান ব্যক্তি! জজ্‌ব দুই প্রকার- যার এই দুই প্রকার জযব হাসিল
থাকবে, সে জগতে মর্যাদাবান ব্যক্তি।
প্রথমটি হল খাস (বিশষ) জজ্‌ব এবং দ্বিতীয়টি আম (সাধারণ) জজ্‌ব,
খাস জজ্‌ব আম (সাধারণ) জজ্‌বের চুড়ান্তরূপ।
হে সুমহান ব্যক্তি! আম জজ্‌ব উহাকে বলে,
যেটির নিসবত (সম্পর্ক) পীরের মাধ্যমে সরাসরি হবে।
হে সুমহান জনাব! জেনে রাখ, খাস জজ্‌ব উহাকে বলে,
সে আহমদ নামের অধিকারী ব্যক্তির নিসবত দ্বারা যে ফয়েজ প্রাপ্ত হবে।
তাঁর সাথে পীরের নিসবত হবে কিন্তু পার্থক্য হল,
আহমদী নিসবতের বিপরীত হবে না।
যাঁর নিসবত পীরের সাথে থাকবে মর্যাদাপূর্ণভাবে,
প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিসবত রাসুলের সাথে হবে।
হে বৎস! আহমদের নিসবত আহাদ (এক) এর সাথে,
হে অনবগত! সবার কাছে ইহাই আমার আর্জি।

হে প্রিয়! মুর্শিদ নিসবতের ধনাগার,
যদি সৌভাগ্যবান হতে চাও, তা অর্জন কর।
হে পূণ্যবান! যার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে,
জেনে রাখ! নিঃসন্দেহে উহাকে নিসবত বলে।
হে বেখবর! যদি তুমি খোদার মিলন প্রত্যাশা কর,
তাহলে পরিপূর্ণভাবে কামিল ব্যক্তির পদধুলি হয়ে যাও।
হে ফকির! যদি এর রকম ব্যক্তি তোমার জুটে যায়,
তবে তাঁর উপর মন-প্রাণ দিয়ে উৎসর্গ হও।
তাঁর গোলাম হলে সব কিছু থেকে মুক্তি পাবে,
তখন ধর্মের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে তোমার লাভ হবে।
যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁর পদধুলি হবে না,
খোদার গুপ্ত রহস্য তোমার কাছে উন্মোচিত হবে না।
হে সচেতন ব্যক্তি! এই কথাটি হযরত আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেছেন,
ইহা পড়ে অহমিকা দূর কর।
আমি জগত থেকে আমার হস্ত তুলে নিয়েছি,
আল্লাহওয়ালাদের ইশকের জন্য আমার প্রাণকে বেঁচে নিয়েছি।
আমি পার্থিব জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি,
কামিল ব্যক্তির প্রেম বা দয়াকে আমার বক্ষে ধারণ করছি।
আমি উভয় জগতে পথচলার কষ্ট থেকে মুক্ত হলাম,
আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের পদধুলি হলাম।
যদিও আমি সুলতানদের সামনে আমিরও হই,
তাঁদের (আল্লাহওয়ালা) সামনে আমি ফকির থেকেও কম।
আমি আমার পায়ের নীচে বাদশাহী হিংহাসন ও জমীনকে রাখলাম,
আমি তাঁদের পদধুলি থেকে তুতিয়া (গন্ধকাম্ল) বানাব।
আমি যে কোন কিছুর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত,
কেননা আমি তাঁদের পদধুলিতে পরিণত হলাম।
আমি দুনিয়া ও পরকাল থেকে মুক্ত হলাম,
মিলন আকাশে চাঁদের মত আমি ক্ষত বিক্ষত হলাম।
আমি অক্ষম ও মুখাপেক্ষী হয়ে সর্বদা এই মহান ব্যক্তিদের আস্তানায়
আমার কপাল অবনত করি।
আমি আল্লাহওয়ালাদের পায়ে মাড়াইকৃত শস্য দানা,
কামিলদের পথেরধুলি আমার গন্তব্য।
তাঁদের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি কখনো দৃষ্টি দিও না,

হে বৎস! তাঁদের বাতেনী (আধ্যাত্মিক) নুর হাসিল কর।
অর্থাৎ যদিও বাহ্যিকভাবে তাঁদের চাল-চলন খারাপ মনে হলেও,
হে ভদ্রমহোদয়! তুমি তাঁর গুপ্ত রহস্যের ব্যাপারে অবগত নও।
বাহ্যিকভাবে যদিও তাদের কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়,
তুমি কখনো উহার উপর আমল করিও না।
হে প্রিয় বন্ধু! তাঁরা কি বলেন, তা দেখ,
অর্থ্যাৎ হযরত মওলানাদের (আল্লাহওয়ালা) কথা বার্তা চিন্তা-গবেষণা কর।
ইশকের ধর্ম সমস্ত ধর্ম থেকে আলাদা,
আশেকদের ধর্ম ও পথ হল খোদা।
অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে খারাপ প্ররোচনা দিয়ে থাকে,
হে ধার্মিক ব্যক্তি! তোমার অন্তরে ইহার কিছু খারাপ প্রভাব পড়ে থাকে।
হে প্রিয় বন্ধু! হযরত খিজির ও হযরত মুসা (আঃ) এঁর কাহিনী পড়ে দেখ,
তবে এই গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে তুমি অবগত হবে।

আল্লাহ্‌র বাণী-"তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।" (সূরা কাহাফঃ ৭৮)। ইরশাদ হয়েছে- "পূণ্যবানদের পূণ্য কাজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য পাপ"।

পংক্তি

হে প্রিয় বন্ধু! তোমার পূণ্যকাজ, তাঁদের কাছে তা মন্দ,
হে দূর্ভাগা! এই পার্থক্যটা স্মরণ রাখ।
দেখ তুমি, এই মৌলভী কি লিখেছেন,
হে খোদার বান্দা! তুমি তাড়াতাড়ি ইহা পড়ে দেখ।
সাধারণ ব্যক্তিদের আনুগত্য বা ইবাদত নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে তা পাপতুল্য,
সাধারণের কাছে খোদার মিলন, তা নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে হিজাব (আড়াল) জান।
সাধারণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি থাকে নাম ও কর্মের দিকে,
নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ খোদার নাম ও গুণাবলীতে নিজেদের বিলীন করে দেন।
সাধারণের নজর থাকে কাঁচের বাহ্যিক দৃশ্য, বস্তুর বাহ্যিক নকশা ও রূপের দিকে,
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের দৃষ্টি থাকে ব্যক্তি বা বস্তুর আভ্যন্তরীন আলোর দিকে।
যদি তুমি কাঁচের আয়নার দিকে তাকাও তাহলে হারিয়ে যাবে,
কারণ কাঁচের আয়না থেকে দ্বৈতবাদের সংখ্য উৎপন্ন হয়।
হে বৎস! মওলানা রুমির এই উপদেশ শ্রবণ কর,
আউলিয়াদের যখন শুভ দৃষ্টি মঞ্জুর হয়।
পরিশুদ্ধ শায়খের সামনে তুমি পদধুলি হয়ে যাও,

তবে মাটি থেকে তুমি কিমিয়ায় (স্পর্শমণি) পরিণত হবে।
পীরের ছায়া ব্যতিত নিজের নফ্সের কামনা বাসনাকে হত্যা করা যায় না,
নফ্সের হত্যাকারীর আঁচলকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।
যদি তুমি তাঁকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে খোদার সাহায্য প্রাপ্ত হবে,
তোমার মধ্যে যে শক্তি আসে তা তাঁর জযবার প্রভাব।

হযরত শাহ হোসাইন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'জওহারুল মুলুক' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, এক শ্রেণির আউলিয়া আছেন যাঁদেরকে 'মুস্তাহলিক মারদুদ' বলা হয়। এই জন্য যে, যখন এই শ্রেণির আউলিয়াগণ সুলুক ও ফানা (বিনাশ) এর পর খোদায়ী জামালী (সৌন্দর্য) ও জালালীর (মহাত্ম্য) তাজাল্লী (দ্যুতি) এর মধ্যে শীতলতা, উষ্ণতা, দয়া ও ক্রোধের মাধ্যেমে পরীক্ষিত হয়ে থাকেন । আর সায়ের মা'আল্লাহ ও খোদায়ী গোপন রহস্য, খোদয়ী সত্তা, খোদায়ী তাওয়াজ্জুহ, নফ্স, গুণাবলী, নামসমূহ, কর্মসমূহ, সন্নিবেশিত অবয়ব, বিচ্ছিন্ন অবয়ব এর শীতলতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন, তখন তাঁরা প্রথম স্তরের মা'রেফতের অধিকারী হয়ে যান এবং তখন "আমি তাঁর কান, চক্ষু, হাত ও পা হয়ে যাই"-এই হাদিসের হাকিকত (মূল রহস্য) তাঁদের উপর উম্মুক্ত হয়ে যায়। আর তাঁদের অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সায়ের মা'আল্লাহ এর হুকুম অনুসারে খোদার সাথে মিশে যায়। খোদায়ী হুকুম অনুযায়ী তাঁরা মগলুবুল হাল হয়ে যান। তাঁদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোদার কর্ম সম্পাদনের অঙ্গ হয়ে যায় এবং তাঁদের চক্ষু 'আমার দেখাতে দেখে' এবং তাঁদের কান 'আমার শুনাতে শুনে', তাঁদের হাত 'আমার ধরাতে ধরে' এবং পা 'আমার চলাতে চলে' দ্বারা শুভ বিনিময় হয়ে যায়। তাঁদের রুহানিয়ত (আধ্যাত্মিক শক্তি) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনে 'অতঃপর আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম' এই আয়াতের সহমর্মী হয়ে যায়।

তাঁদের চোখ প্রেমাস্পদের চোখে পরাভূত হয়ে যায়। তাঁদের কাছে প্রেমিক, প্রেমাস্পদ এবং অনুসন্ধানী ও অনুসন্ধিৎসুর সীমারেখা এক হয়ে যায়। আর বহুত্বের দর্শনকে একক সত্তায় করে থাকেন। একক সত্তার দর্শন বহুত্বে করে থাকেন। তাঁদের ভৌতিক দেহ পরিপূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ 'সায়ের ফিল্লাহ' এর পরবর্তীতে কখনও কখনও মুসা (আঃ) এঁর মত উদ্দিষ্ট তুর পর্বতে আরোহণ করে আল্লাহ্র তজল্লীকে (দ্যুতি) দর্শন করেন এবং নিজের প্রেমাস্পদের সাথে কথোপকথন হয়। সেই সময় দর্শনের স্বাদ ও কথোপকথনের শরাবে মাতাল হয়ে "আমার মহিমা! আমার শান কত বড়" এবং "আমার জামায় আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই" এই বাণী সমূহের স্লোগান অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হয়। আর "আমার ঘরে আমি ছাড়া কেউ নেই"

এই বাণীর মর্ম মতে দাবি করতে থাকে। তখন আকস্মাৎ আল্লাহ্‌র সম্মানিত দরবার থেকে ব্যক্তিত্ব চেতনার ঘোষক তাঁকে চাবুক মারতে থাকে। সেই অবস্থায় আদব পূর্ণ ভাষায় "হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি।" (সূরা আরাফ: ১৪৩) উক্ত আয়াতের মর্মকে স্বীকার করে নেয় এবং বলেন-

কবিতা

পার্থিব সংকীর্ণ জগতে আধ্যাত্মিক মর্ম কি মূল্য রাখে?
ফকিরদের কুঁটিরে সুলতান কি কাজ করতে পারে?

তখন ঐ আদব দেখানোর কারণে আল্লাহর সাহায্য ও বাদশাহী সহযোগিতা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম মতে তাঁর অবস্থার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র বাণী- "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।" (সূরা নসর: ১)। আর নির্জন জনশূন্য পথ হারিয়ে ফেলা জঙ্গলে তার হৃদয়কে পথ বাতলানোর দিকে মনোনিবেশ করান। যাতে তিনি জগতবাসীর সাহায্য করতে পারেন। আর নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম মতে খেলাফতের আসনে সমাসীন করা হয়-"এমন কোন নবী নেই, যাঁর দৃষ্টান্ত আমার উম্মতের মধ্যে নেই"। আর ঐ সমস্ত কার্যোপযোগী নৈকট্যের নিয়ামতের দস্তরখানা ও ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অনুসন্ধান; যেটি তাঁর সাথে পূর্ণ আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য ও পূর্ণ সম্পর্ক রাখত, তা অনাদিকাল থেকে ছিল।

'যেন তাঁরা একটি মানব সত্তা'- এই বাণীর মত বহুত্বের দর্পনে একত্বের নুর প্রকাশকারী। তাঁর ওসিলায় বাদশাহ (আল্লাহ) মানবকে হেদায়তের রাস্তায় আনয়ন করেন। আর তাঁর অসিলায় নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের আলোকবর্তিকা (মোমবাতি) পৃথিবীতে আলোকিত করেন। আল্লাহ্‌র বাণী "এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (সূরা আন নসর: ২)। যেহেতু, তাঁর নিকট হেদায়ত (পথ প্রদর্শন) নিতান্ত একটি বৃত্ত এবং অনাদি ও চিরস্থায়ী একটি বিন্দু এবং কাছে ও দূর এক সমান। কেননা, যখন হযরতগণ (আউলিয়াগণ) হাকিকতের (সত্য অনুসন্ধান) লবণাক্ত জলাভূমিতে মিশে যান, তখন তাঁদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ভৌতিক দেহ ও আমিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়। উহার পর তাঁরা কখনও লাহুতি (ঐশ্বরিক জগত) সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। আবার কখনও জবরুতি (অসিম ক্ষমতা), মালকুতি (উর্ধালোক) ও নাছুতি (বস্তুজগত) সমুদ্রে সাঁতার কাটেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - "তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর।" (সূরা মুহাম্মদ: ১৫)। এই সমস্ত লোকেরা একত্বের মহাসাগরে ডুবে আছেন। যা কিছু বলেন একত্বের সমুদ্র থেকে বলেন। হযরত সুলতানুল মুয়াহ্‌হেদীন সাইয়্যেদুত

তায়িফা জুনাইদ বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উক্ত স্তর সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন যে, আমি ত্রিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সাথে কথাবার্তা বলছি এবং লোকেরা জানে যে, তাঁর (আল্লাহ) সাথে কথাবার্তা বলি।

কবিতা

খোদার পথে পথ প্রদর্শন করেন,
হাকিকতের (প্রকৃত রহস্য) ব্যপারে হোঁচট খায়।
সৃষ্টির প্রতি থাকেন সদয়-নিজের ব্যাপারে কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে।
তাঁরা অবগত, দূরদর্শী ও মঞ্জিলে মকসুদে আরোহণকারী,
তাঁরা খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের সাগরে অবগাহন করেন।
ইহাই হল আল্লাহ্‌র অলিদের পূর্ণ অবস্থা-তাঁরা ময়দানের বীর যোদ্ধা।

সমস্ত প্রশংসা ও কল্যাণ আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন ও অসীম পূর্ণতা দ্বারা স্বীয় সম্মানিত হাবিব এবং সম্মানিত খলিফা কুতুবে আলম গাউছুছ ছাকলাইন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত মাহবুবে ছোবহানি গাউছে সামদানী পীরে পীরান মীরে মীরান আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জজ্‌ব ও সুলুক এর অলংকার দ্বারা সুশোভিত করে সম্মানিত আউলিয়াদের মধ্যে নবীদের মধ্যে সুদৃঢ় হিকমতের অধিকারী নবীর (আলাইহিস্‌সালাম) মত তাঁর (আব্দুল কাদের জিলানী) ৬৮২ বছর পর স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা মনোনীত করে প্রেরণ করেন। তাঁর হেদায়তের দিক নির্দেশনা ও আলো দ্বারা বিশাল মরু প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলা পথিককে হেদায়তের রাজপথে নিয়ে আসেন। এবং কর্মস্থল পৃথিবীর সভাস্থলকে সন্তুষ্টির আটটি বেহেশতের ঈর্ষণীয় চিরন্তন আনন্দের বাগান বানালেন। যেহেতু বাঁধা বিপত্তি দূরীকরণ উদ্দেশ্য অর্জনের অগ্রবর্তী। সেই জন্য অধিকাংশ সাবেক আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) সুলুককে জজ্‌ব এর উপর অগ্রবর্তী রাখতেন এবং স্বীয় মুরিদদেরকে যিকির, আযকার ও রিয়াজতের দিকনির্দেশনা দিতেন। স্বীয় প্রভাবকে তাদের সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে রাখতেন। যাতে সমস্ত লতিফাগুলি সচেতন বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর নফ্‌স (মানব সত্তা), তুষ্টিত চরিত্র, তওবা ও খোদার দিকে রুজু হওয়ার মত যুহদ (তপস্যা), ধৈর্য্য, সন্তুষ্টি ও দশটি মকাম এর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যায়। যখন সালেক আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন সেই সময় শায়খ (পীরে কামেল) তাকে জজ্‌বা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপূর্ণ দরবারে পৌঁছিয়ে দেন। উহাকে সুলুকের পরিভাষায় সালেকে মজ্‌জুব বলা হয়। হযরত ফরিদ আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

এই দ্বিতীয় প্রকারকে সালেকে মজ্‌জুব বলে জান,
সাবধানতার সাথে খোদা পথচারী এই পথ অতিক্রম করেন।
অনেক বছর ধরে রিয়াজত ও ইবাদতে রত থেকে পথ অতিক্রম করে জজ্‌বের
যোগ্য হয়ে উঠেন।
যখন তাঁর অন্তর খোদায়ী নুরের যোগ্য হল,
তখন তাঁর পবিত্র প্রাণও খোদার গুপ্ত রহস্যের যোগ্য হল।
তখন জযবা নামক বাজপাখি তাঁকে ছিনিয়ে নেয়,
আর তাঁর প্রাণ হয়ে যায় শুহদ (খোদার দর্শন) স্তরের নৈকট্য প্রাপ্ত।

উক্ত সায়রকে সায়রে আফাখি বলা হয়। যেহেতু এই সায়র অত্যন্ত দূরবর্তী ও দীর্ঘ। আর এতে পরিশ্রম বেশি। এখানে সম্ভব যে, সালেক সুলুকিয়তের মকাম অতিক্রমকালে মৃত্যুবরণ করবে এবং উদ্দেশ্য হতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পূর্ণ রহমত ও ব্যাপক সাহায্য দ্বারা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মজ্‌জুবে সালেক বানিয়ে সমস্ত উম্মতদের কাছে প্রেরণ করেন এবং জজ্‌বকে সুলুকের উপর অগ্রবর্তী করে শিক্ষা দান করেন। তিনি হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় গোলামদেরকে সর্বপ্রথম বাতেনী দৃষ্টিকোণে যিকিরের ফয়জে ইলকায়ি পৃথিবীতে প্রদান করেন। এমনকি ক্বলব, রূহ, সির, খফি, আখফা নিজ নিজ পদ্ধতিতে ফানা হয়ে যায়। আর এই সায়রকে সায়রে আনফুসি বলা হয়। সায়রে আনফুসির অনুকূলে অধিকাংশ সায়রে আফাখিও অর্জিত হয়। আর উক্ত সায়রকে 'ইনদিরাজুন্ নেহায়া ফিল বেদায়া' (শেষ বিষয়কে প্রথম বিষয়ে অন্তর্ভূক্তকরণ) বলা হয়। কেননা, জজ্‌ব হল শেষ ও পরবর্তী পর্যায়। উক্ত সুলুকের শুরুতে উহা অন্তর্ভূক্ত হয়। যখন, বাহ্যিক লতিফা গুলো ফানা হয়ে যায়, সেই সময় রিয়াজত ও মোজাহেদা করার জন্য নির্দেশনা দিতে থাকে। সেই অবস্থায় পার্থিব নফ্‌সের কর্তৃত্ব লতিফা সমূহ থেকে কমে যায় এবং রিয়াযত তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এই সায়র ও সুলুকটি অন্য সায়র ও সুলুকের তুলনায় উদ্দিষ্ট স্থলের দিকে দ্রুত ধাবিতকারী। যদি খোদা অনুসন্ধানী কামালিয়ত অর্জনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তবুও সাধারণভাবে বঞ্চিত হবে না। কেননা, এখানে ক্বলবের যিকির প্রথম ছোহবতে অর্জিত হয়েছে। (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত)। আর মজজুবে মাহাজ যেহেতু বিলীনপ্রাপ্ত ও ফানার স্তরে বিচরণকারী, সর্বদা ইশকে ইলাহীর জজ্‌বা দ্বারা নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পর্কে বেখবর। তাঁর সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর থেকে বেখবর থাকে। তিনি অপরকে হেদায়তের ব্যাপারে কি করতে পারেন? হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন -

মসনবী

অতঃপর ৩য় প্রকারে মজজুবে মুতলককে (মজ্জুবে মাহাজ) গণনা কর,
যিনি খোদার নূরের উজ্জ্বল্যে থাকেন অজ্ঞান।
যিনি খোদার ইশকের মাতালতায় নিজে থাকেন বেখবর,
তিনি অন্যদের কিভাবে পথ প্রদর্শক হতে পারেন?
তিনি যেহেতু নিজেই ইশকে মাতাল ও পার্থিব জ্ঞান-বুদ্ধি বিবর্জিত,
তাঁর উপর শরীয়তের বিধান আরোপ করা বেআইনি হিসেবে গণ্য।
সুনিশ্চিতভাবে মজজুবদের থেকে পথ নির্দেশ গ্রহণ করা উচিত নয়,
এই ব্যপারে আউলিয়া কামেলীনগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
হে অভিজ্ঞ ব্যক্তি! মজ্জুবদের দস্যুতা থেকে বেঁচে থাক,
কেননা এই পথ বিপদ থেকে মুক্ত নয়।
যদিও মজ্জুব খোদার ব্যাপারে সচেতন,
কিন্তু মজ্জুবকে অনুসরণ করা পথভ্রষ্টতা।

আর সালেকে মাহাজ নিজেই আল্লাহ্‌র ইশক (প্রেম) থেকে বঞ্চিত, সে অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসক হতে পারে না। সেইতো শূণ্যগর্ভ জাহেদ (তপস্যাকারী)। সেই সাধারণ বিবেক বুদ্ধির চাহিদাকে তালাশকারী। সেই আল্লাহ্‌র মিলনের নিয়ামতের দিকে যাত্রাকারী। তাঁর নিজের অন্তর্জালা ও ব্যাথা নেই। অপরের অন্তরের ব্যাথার ব্যাপারে তাঁর কি খবর থাকতে পারে? সেই ইশক ইলাহীর পান পাত্র থেকে অনেক দূরে এবং খোদার মিলনের নিয়ামত থেকে পরিপূর্ণ বঞ্চিত। বরং সেই প্রাণের ইশককে অস্বীকারকারী। সাধারণ লোক তার থেকে হাজার গুণ উত্তম। হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

চতুর্থ প্রকার হল সালেকে মাহাজ; যে খোদায়ী জজ্‌বার অধিকারী নয়,
সে সুলুকিয়তের স্তরে নিজেকে উপনীত করতে পারেনি।
সালেকে মাহাজ যেহেতু খোদার সাথে মিলন লাভ করতে পারেনি,
সে তরিকতের পথে অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।
সালেকে মাহাজ জজ্‌বার অধিকারী নয়, সে খোদা সম্পর্কে সচেতন নয়,
সে মঞ্জিলে মকসুদ ও তরিকতের পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।
যেহেতু সে মঞ্জিলে মকছুদ ও তরিকতের পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়,
বল, সে কি করে অন্যকে পথ দেখাতে পারে?
যেহেতু সে খোদার মিলন লাভকারী নয়, তাই সে পথ প্রদর্শক হতে পারে না,
যেহেতু সে ইহার (খোদা মিলন) স্বাদ আস্বাদন করেনি, তাই কি করে সে পথ প্রদর্শক হয়?

যদি এরূপ অসভ্যকে তুমি অনুসরণ কর,
তাহলে তুমি সঠিক পথ পাবে না, তোমার পরকালকে নষ্ট করে দিবে।

এই সমস্ত লোক থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। তাদের ছোহবত (সাহচর্য) অন্তরের ব্যাধি বৃদ্ধির কারণ। যেহেতু সে নিজে ইশকের নিয়ামত ও প্রেমের ব্যাথা থেকে বঞ্চিত। সেই কবে আশেক ও ইশকের ব্যাথায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসক হতে পারে?

কবিতা

হে প্রশান্ত মন, অন্তরের আর্তনাদের অবস্থা তুমি কি জান?
বিচ্ছেদ-বিরহে কাতর আশেকের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সম্পর্কে তুমি কি জান?

মূলত যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইশকের নূর থেকে দৃষ্টিহীন, তার জন্য হযরত মজ্‌জুবে সালেকের ছোহবত (সাহচর্য) কিবরিয়তে আহমর (লাল গন্ধক) তুল্য। যদি খোদা অনুসন্ধানী তাঁদের (মজ্‌জুব সালেক) ছোহবত (সাহচর্য) থেকে বঞ্চিত, তবে ছালেকে মজজুবের ছোহবতও গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

আউলিয়াদের সাথে এক মুহূর্তের সাহচর্য্য
একশত বছরের বে-রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ইবাদত থেকে উত্তম।
যদিও তুমি হও পাথর বা মার্বেল পাথর,
আউলিয়াদের কাছে গিয়ে তুমি রত্নে পরিণত হবে।
তোমার হৃদয়ে পবিত্র ব্যক্তিদের ভালবাসর বীজ বপন কর,
প্রশান্ত ও আনন্দচিত্ত ব্যক্তিদের ভালবাসা ছাড়া তুমি হৃদয়কে কিছুই দেবে না।
হতাশার কাছে যেও না, কারণ আশা বিদ্যামান,
অন্ধকারের দিকে যেও না, কারণ সূর্য বিদ্যমান।
হৃদয় তোমাকে হৃদয়বান পুরুষদের (আউলিয়া) কাছে নিয়ে যাবে,
আর দেহ তোমাকে পানি ও মাটির কারাগারে নিয়ে যাবে।
হ্যাঁ, তোমার হৃদয়কে এমন একজনের কাছ থেকে মনের খোরাক দান কর, যে এটার সাথে সঙ্গতি রাখে,
যাও! এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসন্ধান কর এমন একজনের কাছে থেকে যে উন্নত।
অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর,
তাহলে তুমি তাঁর অনুগ্রহের কারণে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।
সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ করবে,
খারাপ সঙ্গ তোমাকে মন্দ লোকে পরিণত করবে।

ষষ্ঠ ফরতুঃ পীরের সাথে নিসবত ও রাবেতার (সম্পর্ক) বর্ণনা প্রসঙ্গে

পীরের সাথে রাবেতা (সম্পর্ক) স্থাপনের জন্য পীরের হাত স্পর্শ করে বায়াত করা আবশ্যকীয় শর্ত নয়[১]। বরং যে কোন উপায়ে নিসবত অর্জিত হওয়া তথা বায়াত নেওয়া এবং ছোহবত (সাহচর্য) দ্বারা সুশোভিত হওয়া অথবা হযরত পীর খেরকা প্রদান করা অথবা টুপি দান করা অথবা কাঁচি চালানো অর্থাৎ মুরিদের মাথা থেকে স্বল্প পরিমাণ চুল কর্তন করা অথবা মুরীদকে স্বীয় ছোহবত (সাহচর্য) ও খেদমতে কবুল করা এক্ষেত্রে যথেষ্ট। হযরত হাফেজ সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতাংশ

সৌভাগের ধনাগারের চাবি প্রেমাস্পদকে গ্রহণ করার মধ্যে নিহিত।

পূর্ণতা (কামালিয়ত) স্তরে পৌঁছার জন্য আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর তরিকার শায়খে মুকতাদা'র (শায়খে কামিল) সাথে মহব্বতের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। একনিষ্ট খোদা অনুসন্ধানী এই মহব্বতের পথ দ্বারা যাহা সে নিজ পীরের সাথে রাখেন, তা দ্বারা ফয়জ ও বরকত তাঁর (পীর) বাতেন (অন্তর) থেকে অর্জন করেন। আর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে সে (মুরিদ) তাঁর (পীর) রঙ্গ ধারণ করে। তরিকতের বুজুর্গদের বাণী-'ফানা ফিশ শায়েখ' (পীর কামেলে ফানা হওয়া) হল 'ফানা ফিল্লাহ' (আল্লাহতে ফানা হওয়া) এর মূল কথা ও অগ্রবর্তী। হযরত শাহ নিয়াজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

আশেকদের মাদ্রাসায় (বিদ্যালয়) যার বিসমিল্লাহ পাঠ হল,
বন্ধুগণ! তার প্রথম পাঠ 'ফানা ফিল্লাহ' হল।

উল্লেখিত রাবেতা (সম্পর্ক) ও 'ফানা ফিশ্‌শায়খ' ব্যতিত যিকর (খোদা স্মরণ) খোদার দিকে পৌঁছার পথ প্রশস্ত করে না। যাই হোক, যিকর হল খোদার দিকে পৌঁছানোর উপকরণ। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে (যিকর) ইহা (যিকর) মহব্বতের সম্পর্ক ও 'ফানা ফিশ শায়খ' এর সাথে শর্তযুক্ত। হ্যাঁ, এই রাবেতা (সম্পর্ক) চোহবতের আদব সংরক্ষণ ও পীরের তাওয়াজ্জুহ ও দৃষ্টি দ্বারা যিকিরের পদ্ধতি পালন ব্যতিত অর্জিত হয়। যেহেতু অন্যন্য তরিকায় কর্ম

[১] এক্ষেত্রে যেকোন উপায়ে বায়াত হলে যথেষ্ট (অনুবাদক)।

পরিধি, অজিফা, জিকির-আযকার, রিয়াজত ও চিল্লা করা পীরে তরিকতের উপর সীমাবদ্ধ নয়। আর এই তরিকায়ে আলিয়ায় ফায়দা (কল্যাণ) ও ফয়জ লাভ জজ্‌বা প্রসূত। সেই জন্য আদব সহকারে শায়খে কামেলের সোহবত (সাহচর্য) যথেষ্ট।

আর অযিফা, যিকির-আযকার ও ইবাদত বন্দেগী সহায়কের শ্রেণিভুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সোহবত (সাহচর্য) কামালিয়ত অর্জনের জন্য ঈমান, তাসলিম (আত্মসমর্পন) ও আনুগত্যের শর্ত সহকারে যথেষ্ট ছিল। সেই কারণে এই তরিকায় খোদার কাছে পৌঁছা অধিকতর নিকটবর্তী। বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর, জীবিত ও মৃত শায়খে কামেল মুকাম্মেল থেকে ফয়জ ও বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে এক বরাবর। যার কাছে এই খোদায়ী সম্পর্ক ভাগ্যে জুটেছে, সে দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত পেল। শায়খের বেলায়ত সমস্ত কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পাদন করবে। সেই কারণে মাশায়েখে কেরামদের ঐক্যমত হয়েছে যে, ইহা থেকে উত্তম ও উন্নত কোন তরিকা নেই। 'রেসালায়ে বরযখিয়া' গ্রন্থে আছে যে, প্রথমে মুবতাদির (আরম্ভকারী বা মুরিদ) উচিত যে, শায়খের কথার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যখন ইহাতে সক্ষমতা অর্জন করবে, তখন শায়খের কর্মকাণ্ড সমূহের দিকে অধিকাংশ নজর রাখবে। অতঃপর শায়খের গুনাগুন বা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যখন ইহাতেও সক্ষমতা অর্জন করবে, তখন শায়খের সত্তার দিকে মত্ত হবে। একজনে (শায়খ) ফানা হওয়া এক্ষেত্রে সবটার জন্য যথেষ্ট। ফলে 'ফানা ফির রাসূল' ও 'ফানা ফিল্লাহ'ও তার অর্জিত হয়ে যাবে। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

যখন তুমি পীরে কামেলের সত্তাকে কবুল করে নিয়েছ,
তুমি তাঁর সত্তায় খোদা ও রাসুলের জলওয়া (দ্যুতি) দেখতে পাবে।
তুমি দুই জানিও না, দুই দেখিও না এবং দুইয়ের অনুসন্ধানী হয়ো না,
তুমি তাঁর (পীরে কামিল) সত্তাকে খোদার সত্তায় বিলীন মনে কর।
যদি তুমি পীরে কামেলকে খোদা থেকে আলাদা দেখ,
তবে হাকিকতের মূল রহস্য হারিয়ে ফেলবে।
পীরে কামেলকে যে দুই দেখেছে সে পথভ্রষ্ট হল
এবং সে প্রকৃতপক্ষে মুরীদ হল না।
নবী (আলাইহিস্‌সালাম) ও আউলিয়াদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) সত্য মনে কর,
তাহলে তোমার কাছে গুপ্ত রহস্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।
মানবের মধ্যে সূর্য (পীরে কামেল) ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে-

ইহা অনুধাবন কর, আল্লাহ সঠিক বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ তায়ালা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কেননা তিনি পুরুষ ও নারী ব্যতিত সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন হযরত আদমকে (আলাইহিস্সালাম) সৃষ্টি করেছেন। অথবা নারী ব্যতিত সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করেছেন। যেমন হযরত হাওয়া (আলাইহাস্সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন। অথবা পুরুষ ব্যতিত সৃষ্টিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন। যেমন হযরত ইসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস্সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উক্ত পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিরাকার ও অদ্বিতীয় মহান কর্ম সম্পাদনকারী ও পবিত্র সত্তা প্রজনন ও জন্মদান স্বামী ও স্ত্রীর উপর স্থির করেছেন। আর এই কুদরত (ক্ষমতা) ও কর্মকৌশল নিজেকে (আল্লাহ) প্রকাশ করে দেখালেন। আমাদের মধ্যেও এই ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু আমাদের পছন্দ এই ভাবে। দেখ! একটা কালো কাপড় লও। আর যতটুকু চাও আকাশের দিকে তুলে ধর। কখনও (কাপড়ে) আগুন লাগবে না। আগুনের শিখা (কাপড়ের) মাঝখানে রাখ। তখন ইহা (কাপড়) সূর্য থেকে যত দূরেই হোক না কেন ততক্ষণাৎ আগুন ধরে যাবে। তুমিও নিজকে কালো কাপড়ের মত মনে কর। আর তিনি (আল্লাহ) নিরাকার তুলনাহীন সত্তাকে সূর্য মনে কর। আর শায়খে মুকতাদা (কামিল পীর)কে আগুনের শিখা নির্ধারণ কর। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাবান যে, স্বীয় নেয়ামত কোন মাধ্যম ব্যতিত দান করবেন। কিন্তু আল্লাহ্র নিয়ম এইভাবে জারি আছে যে, মাধ্যম সহকারে দান করবেন। আল্লাহ্র বাণী- "আপনি আল্লাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।"(সূরা আহযাবঃ ৬২)। যেরূপ কা'বা শরীফ ইবাদতকারী ও উপাস্যের মাঝে রাবেতা স্বরূপ (সম্পর্ক স্থাপনকারী)। সেইরূপ মুর্শিদ প্রকৃত হেদায়তকারী (আল্লাহ) ও হেদায়ত তালাশকারী মুরিদদের মাঝে রাবেতা স্বরূপ। যাইহোক, পৃথিবীটা অনেক মাশায়েখে কেরামদের দ্বারা ভরপুর। কিন্তু নিজের শায়খের সমকক্ষ কাউকে মনে করবে না।

কবিতা

প্রেমাস্পদ যদি হাজার হাজার রয়েছে।
স্বীয় প্রেমাস্পদ (মুরশিদ) এই একজনই।
আকাশে সূর্য একটি কিন্তু, নক্ষত্র হাজার হাজার।

ইহা ভুল কথা যে, মুর্শিদ ধর শক্তভাবে ধর। যে ব্যক্তি একজনের কাছে (শায়খ) গ্রহণযোগ্য, সে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি একজনের (শায়খ) কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কারো কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) প্রকৃত পক্ষে সবাই মিলে এক।

কবিতা

সমস্ত আউলিয়া প্রকৃতপক্ষে এক দেহ বিশিষ্ট এবং বেশী নয়।
চাই, মাইজভাণ্ডারের বাদশাহ (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী) এঁর কুকুর হোক
বা বাগদাদের বাদশাহ (বড়পীর) হোক।

নির্বোধের মত ইহা চর্চাকারী হয়ো না যে, যেই ফকির (অলি) আসবেন তাঁরই হয়ে থাক। নয়! নয়! সবাইকে আদব কর, বিনয় ও সেবার মাধ্যমে এগিয়ে আস। আর নিজের শায়খকে (মুর্শিদ) ছাড়িও না। আল্লাহ্‌র বাণী- "আমরা তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।" (সূরা বাকারাঃ ২৮৫)। উক্ত আয়াতের মর্ম অনুধাবন কর। সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আলাইহিস্‌সালাম)। কিন্তু যার সাথে তোমাদের অধিকতর নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তিনিই তোমাদের পিতা। তার মালিকানার উত্তরাধিকার হতে পার। বরং নিজের পিতার মাধ্যমে যত পরিমাণ দূরে থাক, তবুও দাদার অংশ পেতে পার। কিন্তু পিতার মাধ্যম ত্যাগ করে কোন আত্মীয়ের পরিত্যাক্ত সম্পদ পাবে না। ইহা অত্যন্ত খারাপ কথা যে, আজকে একজনের মুরিদ হল, আগামীকাল অন্যজনের। এইরূপ ব্যক্তি সর্বদা বঞ্চিত হয়ে থাকে। কোন শায়খ এইরূপ ব্যক্তির দিকে অন্তরদৃষ্টি দেন না। যখন অন্তরদৃষ্টি দেননা তখন কি উপকার হবে?

পংক্তি

হৃদয় হৃদয়ের দ্বারা পথ প্রাপ্ত হয়,
এই ব্যপারে সচেতন ব্যক্তি তা জানে।

হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসিরে লিখেন। আল্লাহ্‌র বাণী - "যারা বংশধর ছিল পরস্পরের" (সূরা আলে ইমরানঃ ৩৪)। বেলাদত (জন্ম) দুইভাগে বিভক্ত। যথা ঃ সুরি (বাহ্যিক) ও মা'নবী (অপ্রকাশ্য)। পূর্ববতী যুগে যে সমস্ত নবী অপর নবীর (আলাইহিমুস্‌সালাম) তাওহীদ, মা'রেফত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অনুসৃত নবীর (আলাইহিমুস্‌সালাম) আধ্যাত্মিক সন্তান, বর্তমান সময়ের শায়খদের সন্তান-সন্ততির মত। যেমন বলা হয় যে, পিতা তিন জন। একজন হলেন তিনি, যিনি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। দ্বিতীয় জন হলেন-যিনি তোমাকে লালন পালন করেছেন। তৃতীয় জন হলেন-যিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বাহ্যিক জন্মের ক্ষেত্রে শরীর বা দেহের অস্তিত্ব মাতার গর্ভাশয়ে পিতার বীর্য দ্বারা জন্ম লাভ করে। অনুরূপভাবে, অপ্রকাশ্য জন্ম লাভের ক্ষেত্রে ক্বলব (অন্তঃকরণ) এর বিদ্যমানতা প্রশিক্ষক

শায়খের তাওয়াজ্জুহের নিঃশ্বাসে নফ্সের মানসিক শক্তির গর্ভাশয়ে প্রকাশিত হয়। সেই দিকে হযরত (আলাইহিস্সালাম) এঁর বাণী ইঙ্গিতবহ- "সে কখনো আসমানের উর্ধালোকে প্রবেশ করতে পারবে না, যে দ্বিতীয়বার জন্ম লাভ করেনি"। যেমন প্রকাশ্যভাবে অধিকাংশ নবীগন একই প্রজন্ম (বংশধর) এবং মেজাজের ক্ষেত্রে একে আপরের সাদৃশ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে অপ্রকাশ্য জন্মের ক্ষেত্রে মুরিদ আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে স্বীয় পথপ্রদর্শক মুর্শিদের একই রং ধারণ করা আবশ্যক। সেই ক্ষেত্রে তাছাওরে শায়খের (শায়খের অবয়ব কল্পনা করা) বড় দখল রয়েছে। হযরত মাশায়েখ কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বলেন, শায়খের বরযখ বড় প্রভাবশালী। তার চেয়ে বড় মূর্তি পূজা অন্য কোন বিষয় নয়। যদিও প্রকাশ্যভাবে মূর্তি পূজার মত। হযরত মাওলানা শাহ নিয়াজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, 'মূর্তি পূজা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই'। হযরত আমির খসরু (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

কবিতা

'মানুষ বলে যে খসরু মূর্তি পূজা করে, হাঁ হাঁ, আমি মূর্তি পূজা করি।
পৃথিবীর লোকদের সাথে আমার কোন কাজ নেই'।

পংক্তি

আমার বন্ধুর মুর্তি আমার কাছে হযরত ইব্রাহীম খলিল (আ.) এঁর মত মনে হয়েছিল,
এটি একটি মূর্তি রূপ, এর বাস্তবতা মূর্তি ভঙ্গকারী।

খোদার রহস্যাদি মুর্শিদের অবয়বে নিহিত। হাকিমে উম্মতে মুস্তাফা হযরত মওলানা শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় পুস্তিকা 'আশবাহ ফি সালাসিলি আউলিয়াল্লাহ'তে হযরত সুলতানুল মুওয়াহ্হেদীন বুরহানুল আশেকীন হুজ্জাতুল মুতাওয়াক্কেলীন শায়খুল হক ওয়াশ শরা' ওয়াদ্দীন মওলানা কাযি খাঁন ইউসুফ নাছেহী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মুর্শিদের বাহ্যিক অবয়ব প্রকাশ্যভাবে অবলোকন করা যায়। ইহা পানি ও কাঁদার অবগুন্ঠনে আল্লাহ তায়ালার দর্শন। আর মুর্শিদের যে বাহ্যিক অবয়ব নির্জনতায় প্রকাশিত হয় পানি ও কাঁদার অবগুন্ঠন ব্যতিত উহা আল্লাহর দর্শন। হাদিসের বাণী- 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আদম (আলাইহিস্সালাম) কে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। যে আমাকে দেখল, সে আল্লাহকে দেখল'। এই বাণীটি এ ক্ষেত্রে যথার্থ।

কবিতা

যদি খোদার জাতের (সত্তা) তজাল্লি (নুরের আলোকছটা) দেখতে চাও,
তাহলে মানুষের আকৃতিকে দেখ,

খোদার সত্তাকে মানবের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যভাবে প্রোজ্জ্বল দেখ।

কতেক নির্বোধ উক্ত পূণ্য কর্মের পথের কাঁটা হয়ে যায় এবং বলে বসে যে, জায়েজ নয়। কেননা উক্ত বিষয়টি ফিকহের কিতাব সমূহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। ঠিক কেউ যদি তাদের জিজ্ঞেসা করে, ফিকহ শাস্ত্রের সাথে উহার কি সম্পর্ক? ফিকহের মধ্যে তো বাহ্যিক আমল সমূহের বর্ণনা রয়েছে এবং বাতেনী মাসয়ালার বর্ণনা ও উল্লেখ তো সেখানে নেই? ইহা এমন একটি দৃষ্টান্ত যে, কেউ তরকারির দোকানদার থেকে আতর চাইতে লাগল অথবা আতরের দোকানে গিয়ে সেখানে দুধ খুঁজতে লাগল। এতদ্সত্ত্বেও যদি ফিকহ থেকে উহার প্রমাণ চাও, তাও তাতে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা নিজেদের স্বল্প গবেষণায় অবগত হতে না পারার কারণে তা জানতে পারছ না। যদি কোন বিষয়ের উপর কোন নস (কোরআন-হাদিসের দলিল) আদেশ ও নিষেধমূলক বিদ্যমান না থাকে, তখন উক্ত বিষয়টির ইবাহত (বৈধতা) মূলতঃ বিদ্যমান থাকে; যা অধিকাংশ ফকিহদের মতামত। বরং উসুলে ফিকহের কায়েদা (বিধান) হল- বস্তুর মৌলিকত্ব হচ্ছে মোবাহ (বৈধতা)। যেমন ইহা অধিকাংশ হানেফী ও শাফেয়ীদের অভিমত।

এই সমস্ত লোক ইহাও অভ্যাসে পরিণত করেছে যে, যদি কেউ ইহা যথার্থ মনে করে তাহলে তারা বগল ঝেঁকে কথা বানায় যে, ইহাতো ঠিক আছে। কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে নিষেধ করা হয়। যাতে পীরের পূজা না করতে থাকে। (তারা) ইহা বুঝে না যে, যদি এই নিয়ম হয়, তাহলে নামাজও বন্ধ করে দাও। ইহাতে সম্ভাবনা আছে যে, রিয়াকার (প্রদর্শনেচ্ছা নামাজী) না হয়ে যাও অথবা কা'বা অথবা ইমামকে সিজদার যোগ্য বানিয়ে না ফেল। বরং প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে এই ধরণের সংশয় সৃষ্টি হয়। হযরত মুসলেহ উদ্দিন সাদী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)-السلام عليك يا ايها النّبي (হে নবী (দঃ) আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উক্ত বাক্যে সম্বোধন সূচক 'কাফ' বর্ণের ব্যাপারে নামাজে হুজুরি ক্বলবের আলোচনায় বলেন, তাঁর [রাসূল(দঃ)] আকৃতি অন্তরে খেয়াল কর। ইমাম আহমদ কুস্তুলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে বলেন, অন্তরের মধ্যে তাঁর পবিত্র আকৃতি কল্পনা করবে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)ও লিখেন যে, যিয়ারতকারী স্বীয় অন্তরে তাঁর (বুজুর্গ ব্যক্তি) মোবারক চেহারার কল্পনা করবে।

আর ফতোয়ায়ে আলমগীরির মধ্যেও বিদ্যমান আছে, "যিয়ারতকারী তাঁর (বুজুর্গ ব্যক্তি) সম্মানিত চেহারার কল্পনা করবে। যেন তিনি স্বীয় কবরে তার (যিয়ারতকারী) সম্পর্কে অবগত ও তার কথা শুনছেন"। ভালভাবে চিন্তা করে

দেখ যে, উক্ত উদ্ধৃতিটি দ্বারা কি উপকারিতা লাভ হয়। যিয়ারতকারী কল্পনা করবে তাঁর (মাজারে শায়িত বুজুর্গ ব্যক্তি) চেহারা মোবারক, যেন তিনি আরাম করছেন এবং তাকে (যিয়ারতকারী) দেখছেন এবং তার (যিয়ারতকারী) কথা শুনছেন। মওলানা আব্দুল হাই লৌখনবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)- 'যেন আমি রাসূল (দঃ)কে দেখতেছি।' এই বাণীর উপকারিতা প্রসঙ্গে লিখেন- এই হাদিস এবং অনুরূপ হাদিস সমূহ; যা সিহাহ সিত্তার কিতাব সমূহে উল্লেখিত হয়েছে; প্রমাণ করে যে পীরের অবয়ব কল্পনা করা জায়েজ। আল্লাহ্‌র বাণী, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।' (সূরা তওবা)। আল্লাহ্‌র বাণী 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।' (সূরা মুযযাম্মিল-৮)। আল্লাহ্‌র বাণী- ' অতঃপর তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।' (সূরা নাহল)।

উক্ত আয়াত সমূহের তাফসির দেখ যে, সম্মানিত মুফাস্‌সিরগণ কি কি লিখেছেন। প্রকাশ্য বিষয়টি তো প্রকাশ্যে আছে। অপ্রকাশ্য বিষয়টি হল এই যে, শায়খের বরযখ গ্রহণ করবে। 'ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে যা উল্লেখিত হয়েছে- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির ব্যপারে খবর দিব না? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন হাঁ , হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যাঁকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়'। উক্ত হাদিসে দেখ, কত সুক্ষাতিসুক্ষ্মভাবে সাব্যস্ত হয় যে, প্রকাশ্য অবয়ব অথবা অপ্রকাশ্য অবয়ব বরং অপ্রকাশ্য অবয়ব স্থিতিশীলতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। মূলতঃ তাছাওরে শায়খ (শায়খের কল্পনা) এর মাসয়ালা কোরআন, হাদিস ও বিশুদ্ধচিত্ত সুফিয়া কেরামদের ঐকমত্য দ্বারা সাব্যস্ত। হযরত শায়খ হাজি এমদাদ উল্লাহ চিশতী ফারুকী মুহাজেরে মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'জিয়াউল কুলুব' গ্রন্থে বলেন- ক্বলব (অন্তঃকরণ) এর সম্পর্ক শায়খের সাথে বিশ্বস্ত ভালবাসার সাথে এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে এই সুলুকের রাস্তায় পূর্বশর্ত এবং শ্রেষ্ঠ রুকন (ভিত্তি)।

হযরত গাউছে গাওয়ালিয়ারি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় কিতাব 'জাওয়াহেরে হামসা' গ্রন্থে লিখেন- 'নিশ্চয় খোদার রাজ-রহস্য মুর্শিদের অবয়বে আবদ্ধ'। অতঃপর উচিত যে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় মুর্শিদের অবয়ব অর্থাৎ আকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করবে। যেমন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- 'আদম (আলাইহিস্‌সালাম)কে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে' এবং আরো ইরশাদ করেন- 'মানব প্রতিপালকের আকৃতি স্বরূপ'। আরো ইরশাদ করেন-

'মানুষ আমার রহস্য এবং আমি (আল্লাহ) মানুষের রহস্য'। অতএব, মুর্শিদের অবয়ব কল্পনা 'ফানা ফিস শায়খ' এর স্তরে উপনীত করে।

কবিতা

মুর্শিদের আকৃতি যেমনই দেখ, আল্লাহর সৌন্দর্য্যের দর্পন দেখ।

মওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'কওলুল জামিল' গ্রন্থে লিখেন যে, 'শ্রেষ্ঠ রুকন (ভিত্তি) হল ক্বলবকে শায়খের সাথে ভালবাসা ও সম্মানের সাথে সম্পর্কিত করা এবং তাঁর অবয়ব কলপনা করা'। হযরত হাজিউল হারামাইন শাহ্ মুহাম্মদ ছালেহ আবু শাহমা লাহুরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর সম্মানিত দাদা রচিত 'আখলাকে সুফিয়া' পুস্তিকায় উল্লেখ আছে- 'আল্লাহ্র দিকে পৌঁছার ৩য় তরিকা হল রাবেতা (সম্পর্ক) স্থাপন ঐ পীরের সাথে যিনি শাহেদা (খোদার দর্শন) স্তরে পৌঁছেছেন এবং যিনি খোদার জাতের তজল্লী (দ্যুতি) অবলোকন করেছেন। তাঁর (শায়খ) দিদার (সাক্ষাত) নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী খোদা স্মরণের উপকারিতা দেয়। আল্লাহ্র বাণী- 'তাঁরা ঐ ব্যক্তি যাঁদের যখন দেখা হয়, আল্লাহ্র স্মরণ আসে'। আর তাঁদের ছোহবত (সাহচর্য) আল্লাহ্র সাথে বৈঠকের পর্যায়ভুক্ত। তাঁদের অসিলায় অগণিত কল্যাণ ও বরকতের কারণ। বুজুর্গানে দ্বীনের তাসাউফের কিতাবসমূহ উক্ত মাসয়ালায় পূর্ণ। যার বেশি আগ্রহ সে যেন দেখে নেয়। হযরত মওলানা কলিম উল্লাহ জাঁহা আবাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন যে, উদ্দেশ্যহীন মুরিদগণ কোন কাজেরই নয়। মুরিদ হলেন তিনি; শায়খের প্রতি যার ভালবাসা উভয় জগতের ভালবাসার পুঁজি।

হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- 'ক্বিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমার পীর হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর আকৃতিতে তজল্লী (দ্যুতি) প্রকাশ করেন, তাহলে আমি তাকাব না'। এখানে অন্য একটি বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, খোদা তায়ালা মুতলাক (নিরঙ্কুশ) বস্তুর মধ্যেও নেই, সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যেও নেই। সংশয়পূর্ণ বস্তুর মধ্যেও নেই,স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যেও নেই। তিনি (আল্লাহ) সর্ব প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্বতা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। কোন সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা ভুল। নিজের রূহ (আত্মা) কে দেখ যে, ইহা তোমাদের সমস্ত শরীরের পরিচালক। তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দেহ উহার (রূহ) অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু উহা (রূহ) কোন জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। তোমাদের সমস্ত শরীরকে ইহা পরিবেষ্টনকারী। পরকালে আল্লাহ তায়ালার তজল্লী বান্দাগণের

নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্‌র বাণী-'আমার বান্দা আমার ব্যপারে যেরূপ ধারণা করে আমি সে রকমই'।

বরং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তজল্লী প্রকাশ করবেন। লোকেরা উহাকে অস্বীকার করবে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলবে। যখন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তজল্লী প্রকাশ করবেন (তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে)। যখন সিজদা কর তখন ন্যায় বিচার করে দেখ যে, সমস্ত বর্ণসমূহ সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। ইহার (বর্ণ) হাকিকত আলোক ছাড়া আর কি? কোন বর্ণও আলোক থেকে মুক্ত নয় । আলোক বর্ণ সমূহকে পরিবেষ্টনকারী। যেই বর্ণের আকৃতিতে তাকাবে জ্যোতিকে দেখে নাও। ইহা দ্বারা তোমরা উহাও জেনে গেছ যে, কেউ তো প্রকৃত জ্যোতিকে (আলোক) জেনে বর্ণসমূহকে চেনেন। কেননা-'আমি কোন কিছু দেখি নাই। কিন্তু ইহাতে খোদাকে দেখেছি'। আর কেউ বর্ণসমূহ থেকে আলোক পর্যন্ত পৌঁছেন। কেননা-'আমি কোন কিছু দেখি নাই। কিন্তু ইহার পর আল্লাহকে দেখছি'। এই বিষয়টি ঐ সমস্ত হযরতগণের জন্য প্রযোজ্য যাঁরা নিজেদেরকে ফানা করে দিয়েছেন।

কবিতা

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কল্পনায় তোমার হাস্তি (অস্তিত্ব) বিদ্যমান আছে মনে করবে,
তাহলে জেনে রাখ যে, নিশ্চিতভাবে মুর্তিপূজা বাকি আছে।
তুমি বলেছিলে যে, কল্পনার মুর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেছি এবং মুক্তি পেয়েছি,
এই মুর্তি যেটি ধারণা করছ ভেঙ্গে ফেলেছ, তা বাকি আছে।

তার মূল আমিত্বকে বিনাশ করতে হবে। সেই কারণে যিকির-আযকার, ফিকির ও মোরাকাবা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেই গুলো অধিকহারে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। আর কবিতা ও পংক্তি সমূহ সেই উদ্দেশ্যে শুনা হয়ে থাকে। নতুবা-

কবিতা

হে ভাই! তুমিও সেই তোমার একই ভাবনায়,
বাকিদের জন্য তুমি কেবল হাড় ও তন্তু।
তোমার চিন্তা যদি গোলাপ ফুল হয়, তবে তুমি গোলাপের বাগান,
আর যদি কাঁটা হয়, তবে তুমি গোসলখানার পানি গরম করার উনুনের জ্বালানী।

'কশলুল শরীফ' গ্রন্থে আছে যে, কোন বস্তুকে বরযখ বানাতে চাইলে বানানো যায়। কেননা বরযখ মাধ্যমের নাম; যেটি অন্তর ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। সালেকের উদ্দেশ্য সুক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতার কারণে অন্য কোন পবিত্র বস্তুতে আসে না। অতএব, উহার সৌন্দর্য যে বস্তুর মধ্যে খেয়াল

করবে তা যথাযথ এবং উহার নাম বরযখ। আর ইহা আপনার জানা হয়ে গেল যে, উহা (বরযখ) থেকে কোন বস্তু খালি নয়। যেখানে তুমি খেয়াল করবে (বরযখ) পাবে। তবে পার্থক্য এই পরিমাণ যে, স্থুল বস্তুর বরযখ গ্রহণ করলে স্থুলতা সৃষ্টি হবে। আর সূক্ষ্ম বস্তু হতে সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায়। শায়খে কামেলের যাঁর যেরূপ সক্ষমতা দেখা যায়, তিনি সেইরূপ বরযখের হেদায়েত দান করেন। উত্তম কল্পনা সঞ্চিত করার পদ্ধতি এই যে, যে বস্তুতে বেশি মহব্বত (ভালবাসা) থাকে বা যে বস্তু হতে তুমি ভয় পাও উহাকে খেয়াল কর, তাড়াতাড়ি সফল হবে। 'রেসালায়ে হক নামা' গ্রন্থে লিখা আছে, খোদা অনুসন্ধানীদের উচিত যে, নির্জনতায় মুর্শিদের ছুরত বা অবয়ব অথবা মাশুক মাজাজি (রূপক প্রেমাস্পদ) এর কল্পনা করতে থাকবে। হযরত শাহ শরফ উদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া মুনিরীর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মকতুবাত শরীফকে দেখ যে, উহাতে কেমন তাগিদ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শ্রেষ্ঠত্ব উহা হতে সাব্যস্ত করা হয়। যাঁর রাবেতা (সম্পর্ক) বিশুদ্ধ, তিনি সবার থেকে কামিল। 'মকতুবাতে কুদুসিয়া' (পবিত্র ব্যক্তিগণের গ্রন্থ সমূহ)কে দেখ, তাঁরা কি পরিমাণ সেই ব্যাপারে লিখেছেন। মূলতঃ খোদা পথচারীর জন্য শায়খে কামেলের বরযখ কিমিয়ায়ে সা'দত (সৌভাগ্যের পরশমণি)। হযরত মওলানা জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'নফহাতুল উনস' গ্রন্থে বলেন, যার সামান্য রাবেতাও (সম্পর্ক) উক্ত প্রিয় জনদের সাথে হল, আশা করা যায় যে, শেষ পরিণতি তাঁদের সাথে সংযুক্ত হবে। আর আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

৭ম ফরতু : পীর মুরীদের আদব প্রসঙ্গ

তরিকতের আলেমদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় যে, শায়খে মুকতাদা (অনুসৃত পীর) এবং মুর্শিদে রাহনুমা (পথপ্রদর্শক মুরশিদ) মুরিদের জন্য হাকিকি রাসূল এবং আধ্যাত্মিক পিতা। রাসূলে খোদা (দ.) ইরশাদ করেন, 'স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য শায়খ (পীরে কামিল) উম্মতের জন্য নবীর অনুরূপ'। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

পীরে কামেলের হাত ব্যতিত অপরের হাতে হাত রাখিও না (অর্থাৎ বায়াত হয়ো না),
এটা ন্যায্য যে, তাঁর ঐ হাত ধরবে।
হে মুরীদ! যমানার নবীর গলি পথে তুমি খুশিতে থাক,
কেননা তিনি (পীরে কামেল) নবীর নুর হিসেবে আগমন করেছেন।

যেরূপ প্রকাশ্য জন্ম প্রকাশ্য পিতা মাতার সাথে সম্পর্কিত হয়। অনুরূপভাবে, অপ্রকাশ্য আধ্যাত্মিক জন্ম অপ্রকাশ্য আধ্যাত্মিক পিতা পীর-মুর্শিদের সাথে সম্পর্কিত হয়। রূহী (আধ্যাত্মিক) জীবন ও মৃত্যু ফানা ও বাকাকে বলা হয়; যা শায়খের মকামের (স্তর) সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকাশ্য জীবনের সময়কাল প্রকাশ্য জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট; যা কয়েক দিন (অস্থায়ী)। অপ্রকাশ্য আধ্যাত্মিক জীবন; যেটি পীরের আধাত্মিক জন্ম দানের সাথে সংশ্লিষ্ট; তা অনন্ত। শায়খে মুকতাদা (অনুসৃত পীর) মুরীদের জন্য চিরুনী ও ঝাড়ুদার। কেননা, তিনি (শায়খ) স্বীয় ক্বলব (অন্তঃকরণ) ও রূহ দ্বারা মুরীদের অন্তরের প্রকোষ্টকে প্রত্যেক প্রকারের মন্দ চরিত্রের ময়লা সমূহ এবং অসন্তোষজনক কর্মকাণ্ড সমূহ থেকে পাক-পবিত্র করতে থাকেন। পথপ্রদর্শক পীরের অসিলায় সম্মানিত আল্লাহ্‌র দরবারের নৈকট্যের সৌভাগ্য; যা দুনিয়া ও পরকালের সমস্ত সৌভাগ্য থেকে বেশি তা পৌঁছে।

দয়ালু শায়খেরই মাধ্যমে মুরিদ সত্তাগতভাবে অপবিত্র সমস্ত নফ্‌সে আম্মারার মন্দ স্বভাবের পাঞ্জা থেকে পরিত্রাণ পায়। নফ্‌সে আম্মারার অতল গহবর থেকে প্রশান্তির নফসের শীর্ষবিন্দুতে উন্নতি অর্জন করে। কুফরি চক্রান্তের দূর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেয়ে হাকিকি ঈমান ও ইসলামের সৌভাগ্য পেয়ে সমৃদ্ধ হয়। দয়ালু পীরের হকসমূহ সমস্ত হকদ্বারের হক থেকে বেশি। বরং পীরের হক সমূহের তুলনায় অন্যান্য হকদারের হক সমূহ কোনভাবে তুল্য হয় না। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ সমূহের পর পীরের এহসান (অনুগ্রহ) কে; যিনি মুরীদের জন্য রাসূলে হাকিকি, নিজের উপর বড় জানবে। পীরের খেদমত, ভালবাসা ও আনুগত্যকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য

মনে করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের কথা মান্য কর।' (সুরা মায়েদা)। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যে রাসূলের কথা মান্য করল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌র কথা মানল।' (সুরা নিসা)। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে নবী (দঃ)! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (সুরা আলে-ইমরান)। পীরের কথা আনুগত্য করা ফরজে আইন (সুস্পষ্ট ফরজ)। পীরের প্রদত্ত আমল মুরীদের জন্য ফিকহ। সর্বপ্রকার পূর্ণ ও অপূর্ণ কাজ সমূহ অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, পানাহার, শয়ন করা ও চলাফেরা করার ক্ষেত্রে স্বীয় পীরে মুক্তাদা (অনুসৃত পীর) এর অনুসরণ করবে। আর দিন দিন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে স্বীয় পীরের রঙ্গে রঞ্জিত হতে থাকবে।

কবিতা

যে পার্থিব দুনিয়া থেকে মুক্ত হল,
সে পার্থিব বাগানের টিউলিপ ফুলের বাগান দেখেও পেরেশান।

পীর থেকে যা কিছু প্রকাশ পেল, ইহাকে সঠিক মনে করবে। পীরের সমস্ত কর্মকাণ্ড সমূহকে খোদার ইলহাম মনে করবে। পীরের নড়াচড়া, স্থিরতা, কর্মকাণ্ডসমূহ ও চাল-চলনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর আপত্তির স্থান দেবে না। কেননা ইহাতে সামান্য আপত্তিও উত্থাপন করলে বঞ্চনা ও দূর্ভাগ্য এসে যায়।

কবিতাংশ

বে-আদব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

যদি কোন বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়, তৎক্ষনাৎ পীর থেকে জিজ্ঞেস করে নেবে। যদি তাতে সমাধান না হয়, নিজের জ্ঞানের সংকীর্ণতা মনে করবে। কেননা উক্ত দলের (পীরগণ) দোষ অন্বেষণকারীকে সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বাধিক পাপী মনে করা হয়। মুরীদের উচিত যে, স্বীয় অন্তরের দিককে সমস্ত দিক থেকে ফিরিয়ে স্বীয় পীরের সকাশে মুখাপেক্ষী এবং তাঁর ফয়জের অপেক্ষমান করে রাখবে। এমনকি তাঁর হুকুম ছাড়া নফল ইবাদত ও যিকির-আযকারে রত হবে না।

পংক্তি

আউলিয়াদের সাথে এক মুহুর্তের ছোহবত (সাহচর্য),
শত বছরের বেরিয়া (প্রদর্শনেচ্ছাহীন) ইবাদত থেকে উত্তম।

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন যে, সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পরস্পর বলতেন, আমাদের সাথে বস, আমরা এক মুহূর্ত ঈমান গ্রহণ করব। হযরত খাজা আহরার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

নামাজ প্রকৃতপক্ষে কাযা করা যায়,
কিন্তু আমাদের সোহবতের নামাজ কাযা পড়া যায় না।

পংক্তি

যেমন একটি হাস্যোজ্জ্বল ডালিম বাগানকে সতেজ করে,
অনুরূপভাবে আউলিয়াদের সাহচর্য গ্রহণ করলে তোমাকে অলি বানিয়ে দেবে।

কোন বুজুর্গ কোন সালেক ব্যক্তিকে বললেন, হযরত বায়েজিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর ছোহবত (সাহচর্য) গ্রহণ কর। তিনি উত্তর দিলেন, আমি খোদার সাথে ছোহবত (সাহচর্য) রাখি। ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি বললেন, বায়েজিদের সাথে ছোহবত খোদার ছোহবত থেকে উত্তম । অর্থাৎ তুমি নিজ উপলব্ধির ক্ষমতার তুলনা অনুপাতে আল্লাহ্‌র তায়ালার ফয়জ ও বরকতের কিছু পরিমাণ পেয়ে থাক। আর হযরত বায়েজিদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ছোহবতের দ্বারা তাঁর সুউচ্চ মরতবা আনুযায়ী তোমার কাছে ফয়েজ পৌঁছবে। খোদা অনুসন্ধানীর জন্য আবশ্যক যে, এমন স্থানে দাঁড়াবে না যে, নিজের শরীরের ছায়া পীরের ছায়ার উপর পতিত হবে। আর কখনো পীরের জায়নামাজে পা রাখবে না। তাঁর পবিত্রতা অর্জনের স্থানে অজু করবে না। তার বাসন সমূহের মধ্য থেকে কোন বাসন ব্যবহার করবে না। তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রও নিজের কাজের মধ্যে লাগাবে না। তাঁর সামনে পানাহার করবে না। বরং তাঁর সামনে অন্য কারো সাথে কথাও বলবে না। পীরের অনুপস্থিতিতে যে দিকে পীর অবস্থান করেন সে দিকে পা রাখবে না। সে দিকে থুথু ফেলবে না। আর কোন প্রকার অমানানসই কাজ করবে না। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর থেকে আলাদা হবে না। তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে মনোযোগী হওয়া মুরিদের জন্য নিষেধ। নিজের আওয়াজকে পীরের আওয়াজের উপর উঁচু করবে না। প্রত্যেক বিজয় ও ফয়জ যা অর্জিত হয়; তা নিজের পীরের পক্ষ থেকে জানবে। যদিও পৃথিবী আউলিয়া কেরাম দ্বারা পরিপূর্ণ কিন্তু স্বীয় পীরের চেয়ে বেশি কাউকে জানবে না। মজনুনের জন্য লায়লা থেকে বেশি সুন্দরী কেউ ছিল না।

কবিতাংশ

প্রেমাস্পদ যদিও হাজার হাজার হয় কিন্তু প্রেমাস্পদ তিনি একজনই।

হে প্রিয় বন্ধুগণ ! তরিকত আপাদমস্তক আদবে পূর্ণ। বেআদবীর পরিণতি হল সর্বদা বঞ্চনা। আর আদবের ফল হল সরাসরি ফয়জ প্রাপ্ত হওয়া এবং সফলতা। হযরত হাফেজ সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

পংক্তি

হে হাফেজ সিরাজী! জ্ঞান ও উত্তম নৈতিকতা অর্জনে তৎপর হোন,
কেননা বিশেষ ও মহান ব্যক্তিদের মজলিশে অসভ্য লোকদের স্থান ও পথ নেই এবং তারা তাঁদের সাথে থাকার যোগ্যও নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত মুরীদ নিজেকে পথপ্রদর্শক পীরের সন্তুষ্টিতে ফানা করবে না। খোদা পর্যন্ত পৌঁছা তার জন্য অসম্ভব। সৌভাগ্যের গুপ্তধনের চাবি হল পীরের কাছে কবুল হওয়া।

কবিতাংশ

সৌভাগ্যের ধনাগারের চাবিকাটি হল প্রেমাস্পদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা।

মুরিদের বিপদ-আপদ পীরের মনো কষ্টের কারণে হয়। প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু পীরের পেরেশানী তদারকি ও ক্ষতিপূরণ দুঃসাধ্য। হযরত আমির হাসন আলী সানজারি ওরফে হাসন দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' গ্রন্থে হযরত সুলতানুল মশায়েখ মাহবুবে ইলাহী নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহমতুল্লাহে আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, ৭০৮ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৮ তারিখ রোজ সোমবার তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হল। সুলুকিয়ত অবস্থায় কথাবার্তা চলতে লাগল। সুলতানুল মশায়েখ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বললেন- সালেক (খোদা পথচারী) সর্বদা উন্নতি ও কামালিয়তের মুখাপেক্ষী থাকে। সালেক যতক্ষন পর্যন্ত সুলুকিয়তে থাকবেন ততক্ষণ কামালিয়তের আকাঙ্খী হয়। ইহার পর তিনি বললেন, সালেক, ওয়াকেফ ও রাজে' তিন ধরণের ব্যক্তি আছেন। সালেক হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি রাস্তা অতিক্রম করেন। ওয়াকেফ হলেন ঐ ব্যক্তি যার সুলুকিয়তের মধ্যে বিরতি পড়ে। যখন সালেকের আনুগত্যে (ইবাদত-বান্দেগী) কোন একটি বিচ্যুতি পায়, ইবাদতের স্বাদ তার থেকে চলে যেতে থাকে। সেই সময় তার ওয়াকফ (বিরতি) হয়। যদি তৎক্ষণাৎ তদারকি করা হয় এবং তওবা ও রুজু হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করে, তাহলে পুণরায় সালেক হতে পারবে। যদি (আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয়

প্রার্থনা করি) সেইরূপ চলতে থাকে, তাহলে আশংকা হয় যে রাজে' (প্রত্যাবর্তনকারী) হয়ে যাবে।

ইহার পর তিনি ইরশাদ করেন, উক্ত পথে সাত প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়। যথা ১. ইরাজে হিজাব [اعراض احجاب] ২. হিজাবে তাফাসুল [حجاب تفاصل] ৩. সলবে মজিয়ত [سلب مزيت] ৪.সলবে ক্বদিম [سلب قديم] ৫. তসল্লি [تسلي] ৬. আদাওয়াত [عداوت] ৭. ইরাজ [اعراض]। দুইজন বন্ধু আশেক (প্রেমিক) ও মাশুক (প্রেমাস্পদ) একে অপরের ভালবাসায় নিমজ্জিত। যদি (আল্লাহ না করুন) আশেক (প্রেমিক) থেকে কেউ এমন অমানানসই কর্মকাণ্ড করে যা মাশুকের কাছে অপছন্দ হয়। তখন হঠাৎ মাশুক আশেক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই সময় আশেকের জন্য ওয়াজিব হল তৎক্ষনাৎ ক্ষমা প্রার্থনায় রত হওয়া এবং দুঃখ প্রকাশ করা। আর যেভাবেই হোক মাশুককে রাজি করা, যাতে অল্প যে ভুল ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে তা দূর হয়ে যায়। যদি আশেক এইরূপ ভুলত্রুটি বার বার করতে থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তখন উহা 'ইরাজে হিজাব' (পরিপূর্ণ মুখ ফেরানো) হয়ে যায় এবং আশেক ও মাশুকের মধ্যে পর্দা পড়ে যায়। সেই সময় আশেকের জন্য ওয়াজিব হবে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দুঃখ প্রকাশ করা। যদি সেই অবস্থায় ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশের বিরতি প্রকাশ পায়। তখন উহা হিজাবে তাফাসুল হয়ে যায়। অর্থাৎ আশেক ও মাশুকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যায়।

যদি সেই সময়ও স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর বহাল থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল না। তখন 'সলবে মজিয়ত' হয়ে যায়। অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্যের আস্বাদনের যে আগ্রহ ছিল তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আর যদি সে অবস্থায়ও ক্ষমা প্রার্থনা না করে এবং উক্ত বাতুলতায় থেকে গেল তখন 'সলবে ক্বদিম' হয়ে যায়। অর্থাৎ আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী সবকিছু তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। যদি সেই ক্ষেত্রে তওবা ও রুজু হওয়ার মধ্যে ঘাটতি ঘটে, তখন ইহাতে তসল্লি (প্রশান্তি) এসে যায়। অর্থাৎ মাশুক উক্ত বিচ্ছিন্নতায় আরাম বোধ করেন। তাছাড়া তওবা করার ক্ষেত্রে অবহেলা সংঘটিত হয়, তাহলে ঐ ইশক (প্রেম) ও ভালবাসা শত্রুতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইহা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

মুরিদের উচিত যে, স্বীয় পীর থেকে কারামত ও আলৌকিক কর্মকাণ্ড কখনো তালাশ না করা। যদিও তা মনে মনে ও প্ররোচনা বশতও হয়। কখনও শুনেছ যে, কোন মুমিন ব্যক্তি নবীদের থেকে মুজিজা তালাশ করেছিল? মুজিযা

তালাশকারীগণ কাফির ও অস্বীকাকারী। আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

মুজিযা (অলৌকিক ঘটনাবলী) শত্রুকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে,
এক জাতীয় সুগন্ধি কেবল হৃদয় জয়ের জন্য হয়ে থাকে।
অলৌকিক ঘটনা (মুজিযা) ঈমানের কারণ নয়,
এটি এক জাতীয় ঘ্রাণ যা নিজের প্রতি একই ধরণের গুণাবলীকে আকর্ষিত করে।

যদি বাস্তবে দেখ যে, স্বীয় পীর ব্যতিত অপর কোন শায়খ (পীর) থেকে ফয়জ তোমার কাছে পৌঁছল। উহাকেও স্বীয় পীরের পক্ষ থেকে মনে করবে। আর উক্ত কাজকে মনে করবে যে, পীর সমস্ত পূর্ণতা ও ফয়জের সমাবেশকারী। পীর থেকে বিশেষ ফয়জ খাস মুরিদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা। যদিও প্রকাশ্যভাবে অপর শায়খ (পীর) থেকে (উক্ত ফয়জ) পৌঁছেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বীয় পীরের অন্য একটি লতিফা। কেননা উক্ত ফয়জ লতিফার সাথে যথোপযুক্ত হওয়ার কারণে প্রকাশ্যভাবে অপর শায়খের অবয়বে উক্ত ফয়জ সম্পর্ক রাখে। যদিও উক্ত ফয়জ অপর শায়খ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মুরিদ পরীক্ষা স্বরূপ উক্ত লতিফাকে অপর শায়খ মনে করেছেন। ফয়জকে তাঁর (অপর শায়খ) থেকে মনে করেছেন। ইহা একটি বড় ভুল। আল্লাহ তায়ালা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করুন ও বিশ্বাসের উপর অটল রাখুন। মানবকূলের সর্দার রাসূল (দঃ) এঁর অছিলায়। যদি মুরিদ যথাযথ মনে করে যে, কতেক আদবসমূহ নিজে পালনে অক্ষম। যথাযথ ইহা আদায় করতে পারবে না। এই অবস্থায় তার এই অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু আবশ্যক যে, নিজের দোষকে স্বীকার করতে থাকবে। যদি (আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি) আদবের প্রতি লক্ষ্য না রাখে এবং নিজেকে তা পালনে অক্ষম মনে না করে, তখন সে (মুরিদ) উক্ত বুজুর্গের (পীর) ফয়জ-বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পংক্তি

যাকে তুমি এনেছিলে সে ভাল ছিল না,
কিন্তু সে নবী বা পীরে কামিল এর চেহারা দেখে ইশকের দহনে জ্বলছিল।

ঐ মুরিদ যিনি পীরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে ফানা ও বাকা স্তরে পৌঁছে গেল এবং ইলহাম ও ফরাসত (অন্তর্দৃষ্টি) এর পথ তার কাছে প্রকাশ পেল। পীরও তার ব্যপারে এই স্তর সমুহের ব্যপারে স্বীকৃতি দান করেছেন। তার পূর্ণতা ও পূর্ণতা দান করার ব্যপারে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। উক্ত মুরিদের জন্য বৈধ

যে, কতেক ইলহামী বিষয়াদিতে পীরের সাথে মতানৈক্য পোষণ করবেন এবং নিজের ইলহাম অনুযায়ী আমল করবে। বরং এখানে আদব হল যে, সেই জন্য এই মুরিদ সেই সময় তাকলীদ (অনুসরণ) এর বন্ধন থেকে বের হয়ে গেল। তাকলিদ তার (মুরিদ) ক্ষেত্রে ভুল। রাসূলের (দঃ) সাহাবীগণও অবতারিত হয়নি এমন বিধানাবলীর গবেষণামূলক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সাথে কতেক সময়ে মতানৈক্য করতেন। সাহাবীগণের ব্যপারে হক (সত্য) উম্মাচিত হল। শায়খে মুকতাদা (অনুসৃত পীর) আম্বর এর মত। তাঁর (পীর) সাথে যার সম্পর্ক আছে কনিকা ও ধুলিকণার মত তার (পীর) দিকে টেনে নেন। তার থেকে নিজের অংশ পূর্ণভাবে নিবে। আলৌকিক ঘটনা ও কারামত মুরিদদের জজবা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। মুরিদ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে নিজে নিজে জজ্বার অধিকারী হয়। আর যারা উক্ত বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। তাদের (পীর) কামালিয়তের সম্পদ থেকে বঞ্চিত। যদিও তারা হাজারো আলৌকিক ঘটনা ও কারামত দেখে। উক্ত বঞ্চনার স্বাক্ষ্য হল- আবু জাহেল ও আবু লাহাব। আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের ব্যপারে ইরশাদ করেন, "যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী বৈ তো নয়।" (সূরা আনআমঃ ২৫)।

বারেকা (চমক) : গ্রন্থের সমাপ্তি প্রসঙ্গ এবং এতে সাতটি ফরতু রয়েছে।

প্রথম ফরতু : পীরের শুভ অন্তর দৃষ্টিতে সিজদায়ে তাহিয়্যা প্রসঙ্গে

বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের নিকট এই বিষয়টি সূর্যালোক থেকে অধিক স্পষ্ট এবং বিগত কাল থেকে অধিক সুস্পষ্ট যে, যেই বস্তুর সাথে যে কাজটি সম্পর্ক রাখে এবং উক্ত বস্তুটি উক্ত কাজের সময় সামনে রাখা হয় এবং উহার মুখাপেক্ষী হয়। উহাকে প্রচলিত অর্থে ও শরীয়তের পরিভাষায় কেবলা বলা হয়। আর প্রত্যেক কাজের জন্য এক একটি আলাদা কেবলা রয়েছে। তাই দুনিয়াদারদের কেবলা হল দুনিয়া। পরকালবাসীদের কেবলা হল পরকাল। আর মওলা (মালিক/প্রভু) তালাশকারী ও অত্যধিক প্রেমাকূল প্রেমিকদের কেবলা স্বীয় মওলা ও মাশুক (প্রেমাস্পদ)। পার্থিব বিষয়াদির কেবলা হল টাকা-পয়সা, স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ ও পণ্য। আদালত ও ন্যায় বিচারের কেবলা হল ন্যায় বিচারক। অনুরূপভাবে, নামাজের কেবলা হল সম্মানিত কা'বা শরীফ। দোয়ার কেবলা হল বায়তুল মামুর শরীফ। শিক্ষার্থীদের কেবলা হল সজ্জন ও জ্ঞানী শিক্ষক। আর প্রকাশ্য শারীরিক জন্মের কেবলা হল পিতা ও মাতা। আধ্যাত্মিক অপ্রকাশ্য জন্মের কেবলা হল হযরত পীর ও মুর্শিদ। আর দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের কেবলা হল রাসূল মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

রাজাদের কিবলা হল মুকুট ও কোমর (পেশি শক্তি),
দুনিয়াদারদের কিবলা হল সোনা ও রূপা।
মুর্তি উপাসকদের কিবলা হল পানি ও কাঁদা,
জ্ঞানীদের কিবলা হল প্রাণ ও অন্তর ।
যাহেদ (পরহেজগার) ব্যক্তির কিবলা হল মেহরাবে আশ্রয় নেওয়া,
খারাপ চরিত্রের লোকের কিবলা হল অনর্থক কাজ।
শরীর চর্চাকারীদের কিবলা হল ঘুম ও খাবার,
মানুষের কিবলা হল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।
আশেকের কিবলা হল স্থায়ী মিলন,
আ'রেফদের কিবলা হল আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের সৌন্দর্য।
পদবীধারীদের কিবলা হল সম্পদ ও মর্যাদা,
পথিকের কিবলা হল পথের উপকরণ বা পাথেয়।
লোভ লালসাকারীদের কিবলা হল কু-প্রবৃত্তি,
পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কিবলা হল খোদার উপর ভরসা করা।

সেই কারণে জ্ঞানী ও চাক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজ নিজ বুজুর্গদের 'কেবলা' ও 'কা'বা' উপাধি দ্বারা সম্বোধন করে আসতেছেন। ইহা অবগত ও প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ তায়ালার জাত (সত্তা) শরীর ও শারীরিক বিষয় থেকে মুক্ত এবং নমুনা ও ব্যক্তিত্বারোপ থেকে মুক্ত। তিনি দিক ও সীমাবদ্ধতার উর্ধে। তিনি হস্ত সঞ্চালন, বিভ্রম ও ধারণার উর্ধে। আমরা বস্তু জগতের বাসিন্দাদের ঐ নিরাকার সত্তা পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। এই শক্তিহীন ক্ষুদ্র কণার ঐ সূর্য পর্যন্ত পৌঁছার কি সুযোগ আছে? অথচ নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম মতে এই আকৃতি বিশিষ্ট মানব সৃষ্টির উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হল উপাস্য থেকে ইশক (প্রেম) ও ভালবাসার সম্পদ অর্জন করা। ঐ পবিত্র স্রষ্টা থেকে ইবাদত ও মা'রেফতের সৌভাগ্য লাভ করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সূরা যারিয়াহ)। সেইকারণে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া বশত ঃ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও দ্বীনের সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন। এতে স্বীয় উলুহিয়্যাত (প্রভুত্ব) এর রহস্য গচ্ছিত রেখেছেন। আর তাঁর নৈকট্য, সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও সংশ্লিষ্টতা তাঁর ইবাদত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মোদ্দাকথা, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটি হল সম্মানিত কা'বা।

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ অলি উল্লাহ ছাহেব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'ফয়জুল হারমাইন শরীফাইন' গ্রন্থে লিখেন যে, হজ্জ সামগ্রীক পূর্ণতাসমূহ থেকে একটি পূর্ণ পূর্ণতা। সেই কারণে হাজিদের অন্তরে অনেক আনন্দ থাকে। আর উক্ত মাসয়ালাটির গোপন রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছা একটি বড় পূর্ণতা। আর আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির জন্য কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠিত করে এবং উহাকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করে বড় অনুগ্রহ করেছেন। এই অবস্থায় দূরত্ব অনুযায়ী কা'বা শরীফ গমন, প্রকৃতপক্ষে দূরত্ব অনুসারে আল্লাহ্‌র দিকে গমন। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার অনেক দিক রয়েছে। তম্মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছা হজ্ব দ্বারা পূর্ণ হয়। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। উক্ত মওলানা (শাহ অলি উল্লাহ রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'আলতাফুল কুদুস' গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদিকে ভালবাসা হল কুরআন, নবীগণ ও কা'বা শরীফকে ভালবাসা। বরং প্রত্যেক ঐ বস্তু সমূহকে ভালবাসা যেগুলো আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এমন কি আল্লাহ্‌র আউলিয়াদেরকেও ভালবাসা এবং উহাকে কতেক সম্প্রদায় 'ফানা ফির রাসূল' বা 'ফানা ফিশ্‌শেখ' বলে থাকেন। মোদ্দাকথা, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর দয়াময় সত্তা, সমস্ত পূর্ণতা সমূহের সমাবেশকারীর নিদর্শন, সৃষ্টির সেরা ও সৃষ্টিকুলের গর্ব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সত্তাকে সমাবেশকারী হিসেবে খোদায়ী রহস্যাদির ধনাগার এবং খোদায়ী

একত্বের নূরের ওঁৎপেতে থাকার স্থান বানিয়ে সমস্ত নিদর্শনাদির হাকিকত সমূহের হাকিকত হিসেবে আল্লাহ গণ্য করেছেন এবং সমস্ত বস্তু জগত সমূহের মূল উদ্দেশ্যের কেবলা এবং নিজের খাস খলিফা বানালেন।

তাই শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় 'কিতাবুত তাজাল্লিয়াত' গ্রন্থে উক্ত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যার সারমর্ম হল এই যে, জানা উচিত- প্রকৃত উপাসনা হল আল্লাহ তায়ালার প্রেম ও ভালবাসা। আল্লাহ তায়ালার কাছে অনাদি জ্ঞান দ্বারা অবগতি আছে যে, সৃষ্টি জীবসমূহ তাঁর (আল্লাহ) আনুগত্য ও ইবাদতের পাক পবিত্রতা এবং প্রেম ও ভালবাসার সম্পদকে চিনবে না। সেইজন্য, তাদের জাতি থেকে এক ব্যক্তিকে স্বীয় রহস্যের ধনাগার এবং খাস খলিফা বানিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। কেননা-

পংক্তি

প্রত্যেক জাতির আনন্দ নিশ্চিতভাবে তার স্ব-জাতির মধ্যে রয়েছে,
অংশ বিশেষের আনন্দ বা স্বাদ তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পর্যবেক্ষণ কর।

আর তাঁদের আনুগত্যকে নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুম মতে স্বীয় আনুগত্য হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ্‌র বাণী, 'যে ব্যক্তি রাসূলের কথা মানল, প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহ্‌র কথা মানল' (সুরা নিসা)। তাঁদের ভালবাসা ও অনুসরণকে নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মমতে তাঁর (আল্লাহ) প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ও অনুসরণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।' (সূরা আলে ইমরান)। তাঁদের অবাধ্যতাকে তাঁর (আল্লাহ) অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য করেছেন (এখানে কথা শেষ)। হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

মসনবী

কারণ খোদা প্রকাশ্যে আসেন না,
এই পয়গাম্বরগণ হলেন খোদার প্রতিনিধি।
আমি ভুল বলছি না; কারণ তুমি যদি মনে কর যে, প্রতিনিধি বা যাকে
প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করা হয়েছে দু'টি ভিন্ন,
তবে এমন চিন্তা খারাপ, ভাল নয়।
না; তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত রূপের উপাসক হও, ততক্ষণ তাঁরা দুইজন- কিন্তু তাঁরা
তাঁর (আল্লাহ) কাছে এক হয়ে গেছেন যে,

তাঁদের আলাদা রূপ হারিয়ে গেছে।
রূপের দিকে তাকালে তোমার চোখ দু'টি,
ইহার চোখের আলোর দিকে তাকাও, তাহলে চোখ চমকাবে।
অবশ্যই যখন তুমি এক রূপের দিকে চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে,
তখন এক মনে হবে, দুইটি ভিন্ন রূপ তোমার দৃষ্টিতে আসবে না।
দুই চোখের আলো আলাদা করা যায় না,
যেহেতু ইহার আলোর দিকে ব্যক্তির দৃষ্টি পড়েছে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন স্থানের শরাফত (সম্মান) স্থানগত দিক থেকে হয় না। বরং প্রত্যেক স্থানের শরাফত (সম্মান) ও ফযিলত (মর্যাদা) উক্ত স্থানের নিবাসীর কারণে হয়ে থাকে। তাই, সম্মানিত মক্কা শরীফ ও কা'বা শরীফের শরাফত ও ফযিলত হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জন্মস্থান ও তাঁর অবতরণ স্থল হওয়ার কারণে। তাই কাজী বায়যাবী, তাফসীরে হোসাইনীর লেখক ও অধিকাংশ তাফসিরকারকগণ নিম্নোক্ত আয়াত - 'আমি এই নগরীর শপথ করি এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' (সূরা বালাদ: ১-২)- এর তাফসিরে লিখেন যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র শপথকে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অবতরণ ও প্রতিবন্ধকতা না থাকার সাথে শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক স্থানের শরাফত ও ফযিলত উক্ত স্থানের অধিবাসীর কারণে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, হযরত মওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত আয়াত- 'অতঃপর আপনি আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান।'(সুরা বাকারা)- এর তাফসিরে লিখেন, কারণ হল-মসজিদে হারামের পূর্বে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সৃষ্টি হয়েছিল।

কবিতাংশ

হে কা'বা! তুমি ইয়েমেনের প্রান্ত থেকে উদয় হলে, তুমি এলে শত সম্মান নিয়ে,
তোমার পবিত্র আগমনে দাও তুমি মৃত প্রাণকে শত পরিশুদ্ধতা।
মক্কা ও তার আশে পাশের এলাকা তোমার উদিত নূরের আলোতে পেল শোভা,
ইয়াসরিব (মদিনা শরীফ) তোমার মাটি দ্বারা হল সমৃদ্ধ ও সুশোভিত।

সেইকারণে, কা'বা মুয়াজ্জামা (কাবা শরীফ) পৃথিবীবাসীদের নামাজের কেবলা[১] এবং কা'বা মুয়াজ্জামার কেবলা হল হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর বরকতময় সত্তা। হযরত জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

---

[১] কেননা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কেবলা হল প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্প্রদায়ের নবীর ক্বলবের (অন্তঃকরণ) প্রতিচ্ছবি। তাই, হযরত ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) নিম্নোক্ত আয়াত-'এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু অধিকাংশ সে বিষয়ে অবগত নয়।' (সূরা আনফাল: ৩৪)-এর

কবিতা

কি সুন্দর! তুমি প্রাণের কিবলা, যদি আমরা সিজদা করি, তবে তোমার দিক সিজদা করব,
তোমার গলি পথ হল প্রাণের কা'বা, যদি আমরা সাঈ (দৌঁড়ানো) করি,
তাহলে তোমার দিকে সাঈ করব।

উক্ত মওলানা 'সিলসিলাতুজ্জাহাব' গ্রন্থে বলেন-

কবিতা

যেহেতু হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত- জামী তাঁর (প্রেমাস্পদ) আঙ্গিনায় ইহরাম বাঁধলাম।
চেহারায় ধুলি-বালি মেখে ঐ রওজা শরীফের দিকে সিজদা করলাম।

অনুরূপভাবে, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ সম্প্রদায় ও উম্মতদের জন্য মূল উদ্দেশ্য ও দ্বীনের কেবলা। যেহেতু অধিকাংশ নবীগণ (আলাইহিস্সালাম) সিরিয়ায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সেই কারণে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' তাঁদের এবং তাঁদের উম্মতদের নামাজের কেবলা হিসেবে নির্ধারণ হয়। আর যেহেতু আমাদের হযরত খাতেমুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নোক্ত আয়াত- 'যখন আমি নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলাম।' (সূরা আলে ইমরান)- এর হুকুম মতে সমস্ত নবীদের সেরা নবী ও সমস্ত রাসূলদের বাদশা। প্রত্যেক নবী তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মত হিসেবে গণ্য। সেই কারণে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করতেন। নবীদের (আলাইহিস্সালাম) কেবলা শুদ্ধ হওয়ার কয়েকটি দিক রয়েছে। তম্মধ্যে প্রত্যেক নবীর (আলাইহিস্সালাম) জন্ম স্থান উম্মতের কেবলা গণ্য হওয়ার ব্যপারে চলমান নিয়ম-নীতি ও আল্লাহ্র সুন্নত হিসেবে জারি আছে। ইহুদীদের সমালোচনায় যা বলা হয় যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নবীদের কেবলার দিকে নামাজ পড়তেন। এখন পেরেশান ও হতাশ হয়ে গেলেন এবং কামনা করতে থাকেন। নিম্নোক্ত আয়াত "ইব্রাহিমের দ্বীন অনুসরণ করুন; যিনি একনিষ্ট ছিলেন।" (সূরা নাহল-১২৩) - এর মর্ম মতে - সম্মানিত কা'বা শরীফ; যেটি হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্সালাম) এঁর কেবলা এবং কেবলাদ্বয়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন এবং হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জন্ম স্থান ছিল; তা যেন স্বীয় অনুগৃহিত উম্মতদের জন্য কেবলা হয়ে যায়। এমনকি তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ব্যপারে অহির অপেক্ষায় অধিকাংশ সময়

তাফসিরে লিখেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ (কা'বা ঘর) প্রকৃত বায়তুল্লাহর ক্বলবের প্রতিচ্ছবি। অতএব, উহার অধিকারের হক্বদার একত্ববাদী পরহেযগারগণ ব্যতিত মুশরিকদের মধ্যে থেকে হতে পারে না।

আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করে তাকিয়ে থাকতেন। অবশেষে হিজরতের ২য় বর্ষে রজব মাসের মধ্যবর্তী সময়ে রোজ সোমবার যোহরের ২য় রাকাত আদায় করার পর এই আয়াত শরীফ নিয়ে জিবরাইল (আলাইহিস্সালাম) আল্লাহ্র দরবার থেকে আগমন করেন। আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দিব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন।"(সূরা বাকারাঃ ১৪৪)। তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজের মধ্যেই সম্মানিত কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই কারণে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইমামুল কিবলাতাইন (দুই কিবলার ইমাম) বলা হয়। মূলত জেনে না জেনে যে কেউ স্বীয় নবীর দ্বীনের কেবলার দিকে সিজদা আদায় করেন। নতুবা পবিত্র সত্তা এক আল্লাহ্র গুণাবলী দিক সমূহ দ্বারা বিশেষিতকরণ থেকে মুক্ত।

বরং 'অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান।'(সূরা বাকারাঃ ১১৫)। তিনি (আল্লাহ) এই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় গ্রন্থ 'তজল্লিয়াত' এ এবং মওলানা জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'সিলসিলাতুজ্জাহাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যার সারমর্ম এই- জানা উচিত, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ প্রতিপালককে চেনার ব্যপারে একটি আক্বিদা (বিশ্বাস) প্রতিষ্ঠিত আছে। যার মাধ্যমে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং উক্ত বিশ্বাসের উপর তাকে অনুসন্ধান (পরীক্ষা) করা হয়। অতএব, যেই সময় আল্লাহ তায়ালা তার বিশ্বাস অনুসারে তজল্লি (দ্যুতি) করেন, সেই বান্দা স্বীয় প্রতিপালককে চেনে নেয়। তাঁর (আল্লাহ) প্রভুত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যখন তার আক্বিদার(বিশ্বাস) বিপরীত তজল্লি করেন, তখন সেই বান্দা অস্বীকার করে এবং উহা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর, মৌলিকভাবে সে বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে এগিয়ে আসে। অথচ ঐ বান্দা নিজ অন্তরে মনে করে যে, আমি আদব করতেছি।

অতএব, উক্ত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির মাবুদ (উপাস্য) উনাকে গণ্য করা হয়, যাঁকে সে বিশ্বাস করে আছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে স্বীয় উপাস্যের ব্যপারে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে আছে, সে তার উপাস্যকে সেইরূপ দেখে। অতএব, উক্ত অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে স্বীয় বিশ্বাস দ্বারা লব্ধ মাবুদ (উপাস্য)কে দেখেছে, মাবুদে হাক্বিক্বি (প্রকৃত উপাস্য) কে দেখেনি। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দিদার (দর্শন) হবে মানুষের শ্রেণিভেদে তাদের বিশ্বাস ও মা'রেফত অনুযায়ী; যা তারা দুনিয়াতে অর্জন করেছে। আল্লাহকে না

দেখা ও দেখার কারণ হল-স্বীয় নিজস্ব বিশ্বাসকে নিজের কতেক বিশ্বাসমালার পদ্ধতিতে কতেক বিশ্বাসমালা ব্যতিত সীমাবদ্ধ করার কারণে। অতএব, তুমি নিজেকে উক্ত সীমাবদ্ধকরণ ও শর্তযুক্ত করার বিশ্বাস থেকে বাঁচাও। বিশ্বাসযোগ্য তজল্লির (দ্যুতি) পর্যায় সমূহকে স্বীকার কর এবং অবিশ্বাসযোগ্য কতেককে অস্বীকার করে বস। যাতে আল্লাহর প্রকৃত মা'রেফত এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তোমার থেকে ছুটে না যায়। কেননা, ইহা মূলত প্রতিমা বানানো ও প্রতিমা পূজা। আর সে দিকে ইঙ্গিত করছে আল্লাহর বাণী- 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে।' (সূরা জাসিয়াঃ ২৩)।

বরং তুমি স্বীয় সত্তার মধ্যে প্রত্যেক বিশ্বাসযোগ্য পদ্বতির উপাদান ও মূল হয়ে যাও । কেননা, আল্লাহ তায়ালা সীমাবদ্ধকরণ ও শৃংখলিত করণের দোষ থেকে পবিত্র ও মুক্ত। বরং তিনি (আল্লাহ)- 'অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।' (সূরা বাকারাঃ ১১৫)-এই আয়াতের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত [উক্ত আয়াতে 'ওজহুল্লাহ' (আল্লাহ্র চেহারা) দ্বারা আল্লাহ্র জাত (সত্তা) উদ্দেশ্য]। উক্ত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কামিল বান্দাকে যাহেরা (প্রকাশ্য) নামাজ অবস্থায় মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানো আবশ্যক। আর নামাজের অবস্থায় বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত কিবলার দিকে আছেন। আর ইহা- 'অতএব তোমরা যে দিকে মূখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান।' (সূরা বাকারাঃ ১১৫)। উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালার মুখ দ্বারা তাঁর বিরাজমানতার স্তর সমূহের কতেক স্তরের কথা বলা হয়েছে। এবং তিনি নির্দিষ্ট দিকের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অতঃপর চিন্তা ও গবেষণা কর।

হাকিমুল উম্মতে মুস্তফা মওলানা শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'কওলুল জামিল' গ্রন্থে বলেন; যার অনুবাদ মওলানা শাহ খুররম আলী বিলওয়ারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) করেছেন-'আমি বলতেছি, আল্লাহ তায়ালার প্রকাশের অনেক প্রকাশস্থল আছে। এটা ভাবা যাবে না যে, স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন অথবা সূক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন ইবাদতকারী হোক তিনি (আল্লাহ) তার (বান্দা) সম্মুখে বিপরীত প্রকাশিত হয়ে তার (বান্দা) উপাস্য হয়ে গেছেন। এটা তার (বান্দা) মর্তবা (স্তর) আনুযায়ী। আর উক্ত রহস্যের কারণে কেবলার দিকে মুখ করা এবং তিনি 'আরশে সমাসীন হয়েছেন' ইহার ব্যাখ্যায় উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ নামাজ পড়ে, তখন নিজের মুখের সামনে থুথু ফেলবে না। কেননা আল্লাহ তার (বান্দা) ও তার (বান্দা) কিবলার মধ্যবর্তী আছেন'। হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

একজন কালো দাসী থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বল যে, আল্লাহ তায়ালা কোথায় আছেন? দাসীটি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে (দাসী) জিজ্ঞাস করলেন, আমি কে? তখন সে নিজের আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করল। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, সে (দাসী) ঈমানদার।

অতঃপর হে সালিক (খোদা পথচারী) তোমার কোন ক্ষতি নেই এই ব্যাপারে যে, তুমি মুখ ফিরাবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকেই মুখ ফিরাবে। তুমি অন্তর মনোনিবেশ করবে না। কিন্তু উহা (দিল) দ্বারা যদিও আরশের দিকে মুখ ফিরিয়ে উক্ত নুরকে কল্পনা করতে থাক যেটিকে আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর রেখেছেন এবং উহা চন্দ্রের বর্ণের মত অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল বর্ণ। অথবা কেবলার দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে। তাই, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই কথাটি উক্ত হাদিসের যেন ব্যাখ্যাকারী হবে। আর আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

উপকারিতা : গ্রন্থকার টীকায় উল্লেখ করেন যে, বস্তুজগতে আল্লাহ তায়ালার তজল্লী (দ্যুতি) বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী উহাকে উপলব্ধি করে। (এখানেই কথা শেষ)।

হযরত জামি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'সিলসিলাতুজ্ জাহাব' গ্রন্থে লিখেন যে, নামাজ অবস্থায় মসজিদে হারামের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া শরীয়তের অনুসরণের ভিত্তিতে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের আনুগত্য করা। নতুবা আল্লাহ তায়ালার সত্তা যেরূপ নামাজের কেবলার দিকে রয়েছে। অনুরূপভাবে, সমস্ত দিক সমূহে রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা দিক সমূহে বিরাজমান হওয়া, ইহা তানাজ্জুল (অবতরণ) এর দিক থেকে শরীর ও শারীরিক স্তরের মধ্যে। ইহা সত্তাগত দিক থেকে নয়। কেননা তিনি স্থান ও দিক থেকে মুক্ত। যখন ইহা তোমার জানা হয়ে গেল, এখন জেনে রাখ যে, হে প্রিয় বন্ধু! বেলায়ত হল অলির ছায়া এবং নবীর নবুয়তের প্রতিচ্ছবি।

'রেসালায়ে কুদসিয়া' গ্রন্থে হযরত শাহ মুহাম্মদ ফারেসা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন যে, হাকিকতে বেলায়ত (বেলায়তের হাকিকত); যেটি নবুওয়তের মধ্যে লুকায়িত। ইহা (বেলায়ত) সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সাথে থেকে প্রভাব বিস্তার করে এবং অলী প্রকৃতপক্ষে নবীর তাছাররূপ (প্রভাব) এর প্রকাশস্থল। বরং এই হাদিসের হুকুম মতে, "সম্প্রদায়ের জন্য শায়খ, উম্মতের মধ্যে নবীর মত"। পীর ও মুরশিদ স্বীয় মুরিদদের মধ্যে রাসূলে হাকিকির হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ যেরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)